ভানুমতীর বাঘ

শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

মুদ্রক
কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
কে, পাল

টিপ্লু সাহেবকে

দিলাম

ভানুমতীর বাঘ

ভানুমতীর বাঘ

সামনে বড়দিনের ছুটি। কোথায় যাব, কেমন করে ছুটিটা কাটাব ভাবছি, এমন সময়ে খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ বড়দিনের ছুটি কাটাবার সমস্ত বন্দোবস্ত মনে মনে ঠিক করে ফেললাম।

খবরের কাগজে বিহার ও উড়িষ্যার বনবিভাগের বড় কর্মচারী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, মুঙ্গের জেলার ভেতর জামালপুর শহর থেকে কিছু দূরে একটা পাহাড়ের কাছে মানুষ-খেকো একটা কেঁদো বাঘের ভয়ানক উপদ্রব সুরু হয়েছে। সেখানকার গ্রামবাসীরা ভয়ানক বিপন্ন। যদি কোন শিকারী অনুগ্রহ করে বড়দিনের ছুটিতে সে বাঘটি মারবার ব্যবস্থা করেন, তা' হলে গ্রামবাসীদের পরম উপকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও শিকারের আমোদ কিছু লাভ হতে পারে। এ বিষয়ে আর যা কিছু জানবার, বনবিভাগের কর্মচারীর কাছে চিঠি লিখলে তিনি তা' সাগ্রহে জানাতে প্রস্তুত।

তৎক্ষণাৎ বিহার-উড়িষ্যার ফরেস্ট অফিসারের কাছে চিঠি লিখে দিলাম এবং শিকারের সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

এর আগে বাঘ-শিকার কয়েকবার করেছি বটে, কিন্তু তাদের কোনটাই মানুষ-খেকো নয়। সাধারণ বাঘ আর যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তার মধ্যে তফাৎ যে কি ভয়ানক বেশি, তা' হাতে-বন্দুকে শিকার যে না করেছে, তাকে বলে বোঝান একরকম অসম্ভব। ভালো বন্দুক ও হাতের টিপ থাকলে সাধারণ বাঘ শিকারে বিপদ বিশেষ কিছু নেই বললেই হয়। সাধারণ বাঘ বনের আর সব জানোয়ারের মতই ভীতু। মানুষের হাত থেকে কোন রকমে পালাতে

পারলেই সে বাঁচে। আহত না হলে বা নেহাৎ বেকায়দায় না পড়লে সে আক্রমণই করে না। কিন্তু যে বাঘ নর-রক্তের একবার স্বাদ পেয়েছে, তার শয়তানির আর সীমা নেই। মানুষের রক্ত খাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিও সে যেন আয়ত্ত করে ফেলে। নিজে কখনও শিকার করিনি, কিন্তু মানুষ-খেকো বাঘ যারা শিকার করেছে তাদের কাছেই শুনেছি যে, সাক্ষাৎ শয়তানের চেয়েও সে ভয়ঙ্কর। সে যেমন চতুর তেমনি হিংস্র। কত রকম ফন্দি-ফিকির করে যে সে মানুষ মারে, তার অন্ত নেই। সাধারণ বাঘ নয়, সতিকারের মানুষ-খেকো বাঘ শিকার করতে পাব ভেবে সত্যিসত্যিই মনে আনন্দ হচ্ছিল।

দিন তিনেকের ভেতরেই ফরেস্ট-অফিসারের চিঠি এসে গেল। জামালপুর স্টেশনে নেমে কিভাবে বাঘের উপদ্রবের জায়গায় যেতে হবে তিনি তার বিবরণ দিয়েছেন। জামালপুরের কাছেই যে পাহাড়-শ্রেণী আছে, তারই ভেতরকার একটি উপত্যকায় ছোট একটি গ্রাম। সে গ্রামের চারদিকেই পাহাড়ের দেয়াল উঁচু হয়ে আছে। জামালপুর থেকে সেখানে যাবার একটি মাত্র পথ। তাতে গরুর গাড়ি চলে না, হেঁটে যেতে হয়। তবে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাবার মত কুলির ব্যবস্থা ফরেস্ট-অফিসার নিজেই করে রাখবেন জানিয়েছেন।

ছুটি সুরু হতেই রওনা হয়ে পড়লাম। জামালপুরে নেমে দেখলাম ফরেস্ট অফিসার আগে থেকেই কুলি মোতায়েন রেখেছেন। একটা দিনও নষ্ট করবার ইচ্ছে আমার ছিল না। সেইদিন সকালেই চার-জন কুলির ঘাড়ে মাল চাপিয়ে পাহাড়ের পথে যাত্রা করলাম।

পথ খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চড়াই-উতরাই দিয়ে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর। বিকেল নাগাদ আমরা সরু একটা পাহাড়ের পথে এসে পড়লাম। কুলিরা বললে, এই পথ দিয়ে খানিকটা এগুলেই আমাদের গন্তব্যস্থান দেখা যাবে। মিনিট দশেক

সেই পথ দিয়ে যাবার পরই সামনে যে দৃশ্য দেখলাম তা ভোলবার নয়।

পার্বত্য-পথটি হঠাৎ সেখানে নীচে নেমে গেছে। নীচে ছবির মত একটি উপত্যকা। তার তিন ধারেই পাহাড়ের দেয়াল। মাঝখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি গ্রাম আর তারই ধারে ধারে ভুট্টা ও গমের ক্ষেত। পাহাড়ের ওপর থেকে সমস্ত দৃশ্যটা এমন সুন্দর, শান্তিময় দেখাচ্ছিল যে এইখানেই আমি দুর্ধর্ষ কেঁদো-বাঘ শিকার করতে চলেছি সে কথা আমার মনেই ছিল না। এমন সুন্দর শান্তিময় জায়গায় মানুষ সারা দিনরাত বাঘের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে একথা কি সহজে বিশ্বাস করা যায় ?

কিছুক্ষণ বাদেই গ্রামে পৌঁছালাম। গ্রামের মোড়লকে দেখা করবার জন্য ডাকতে পাঠিয়ে রাত্রের মত তাঁবু ফেলবার বন্দোবস্ত করছি এমন সময় ভারী মোটা গলায় 'হ্যালো' শুনে চমকে উঠলাম। এই জঙ্গলে বাঘের রাজ্যে আবার 'হ্যালো' বলে কে ! ফিরে দেখি মোটাসোটা লম্বা-চওড়া ধরনের এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। পরনে তাঁর খাঁকি প্যাণ্ট ও শার্ট, হাতে দোনলা বন্দুক।

লোকটিকে আগে কখনো দেখিনি। কিন্তু পরিচয় করবার কোন রকম চেষ্টা করবার আগেই তিনি সবলে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন —'দুজনেই এক পথের পথিক'—তারপর হাসি। লোকটির চেহারা যেমন বিশাল, গলার আওয়াজও তেমনি বাজখাঁই ধরনের।

আমার কাছে কোনরকম উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি নিজের কথা বলে যেতে লাগলেন।

তাঁর কথায় জানলাম যে দিন-সাতেক ধরে তিনি এই বাঘের সন্ধানে এখানে ঘুরছেন, এখনো পর্যন্ত বাঘ শিকার করা দূরে থাক তার পাত্তাই পাননি। অথচ এই সাত-দিনের ভেতর দুটো মোষ ও একজন মানুষ বাঘের হাতে মারা পড়েছে। তিনি যদি উত্তর দিকে

বাঘের খোঁজে যান ত' শোনেন বাঘ দক্ষিণ দিকে উপদ্রব করছে, আবার তাই দক্ষিণ দিকে রওনা হলে শোনা যায় বাঘ উত্তর দিকে এসেছে। অনেক বাঘ তিনি শিকার করেছেন কিন্তু এমন নাকাল কখনও হননি।

তাঁর কথার শেষে একটু ফাঁক পেয়ে বললাম—'কিন্তু দু'জনে মিলে শিকার করলে আর একটু সুবিধা হয়ত হবে।'

তিনি যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'তা হতে পারে।' তারপর খানিক চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে বললেন—'গাঁয়ের লোকেরা কি বলে জানেন? বলে এ ভানুমতীর বাঘ, কোন শিকারীর সাধ্য নেই একে ছোঁয়। আমাদের আগে আরো তিনজন শিকারী সাহেব নাকি হয়রান হয়ে হার মেনে সরে পড়েছে।'

আমায় হাসতে দেখে তিনি আরও গম্ভীর হয়ে বললেন—'নেহাত ঠাট্টার কথা নয় মশাই, চোখের ওপর থেকে এ বাঘ এমনভাবে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় যে মনে হয় যেন হাওয়াতেই মিলিয়ে গেল।'

বললাম—'বাঘেদের লুকোবার ক্ষমতা অসাধারণ বলেই শুনেছি।'

তিনি শুধু গম্ভীরভাবে বললেন—'হুঁ।'

খানিক বাদে মোড়ল এসে সেলাম দিলে। লোকটা দেখলাম আমাদের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। নেহাত না দিলে নয় তাই বাঘের খবর একটু-আধটু দিলে। তাদের বিশ্বাস শিকারীরা এসে ঘাঁটাচ্ছে বলেই বাঘের উপদ্রব এত বেড়েছে।

বললাম—'শিকারীরা চলে গেলে বাঘের হাতে গ্রাম যে উজাড় হয়ে যাবে।'

মোড়ল একটু রাগের স্বরেই জানালে—'শিকারীরা থেকেই যেন সব হচ্ছে। এই যে পাঁচ-পাঁচটা লোক বাঘের হাতে মারা গেল, পারলে শিকারীরা তার কিছু করতে? এ ভানুমতীর বাঘ, তারা

ভালরকম টের পেয়েছে। ভানুমতীর পূজো না করলে এ বাঘ কেউ তাড়াতে পারবে না।

বললাম—'তা' তোমরা পূজো করোনা কেন?'

মোড়ল বললে—'শিকারীরা বন্দুক নিয়ে গ্রামে থাকলে পূজোর ফল হবে কেন?'

হেসে বললাম—'এ যে ভানুমতীর বাঘ এ কথা কেমন করে জানলে?'

মোড়ল গম্ভীর হয়ে বললে—'দুদিন বাদে আপনিও টের পাবেন।'

খুব খানিকটা হাসলাম, কিন্তু দেখলাম অপর শিকারী সে হাসিতে যোগ দিলেন না।

কিন্তু সে হাসির জন্য পরের দিনই অনুতাপ করতে হবে কে জানত! সকালেই আমাদের একজন লোক এসে খবর দিলে গ্রামের উত্তরে ভুট্টাক্ষেতের পাশে বাঘের পায়ের দাগ দেখা গেছে। জনকুড়ি জঙ্গল তাড়াবার লোক নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেদিকে রওনা হলাম। অপর শিকারী ভদ্রলোকের নাম অজয়বাবু। তিনিও সঙ্গে এলেন। কিন্তু তাঁর ভাব দেখে মনে হল বাঘ মারবার আশা বিশেষ তিনি রাখেন না। মনে মনে হেসে ভাবলাম ভদ্রলোকের এ ক'দিন গ্রামের লোকের সঙ্গে বাস করে বুদ্ধি সুদ্ধিতে একটু মরচে পড়ে গেছে বোধ হয়। মনে হল গ্রামবাসীদের মত তাঁরও ভানুমতীর বাঘে বিশ্বাস হয়েছে।

যেখানে বাঘের পায়ের দাগ পাওয়া গিয়েছিল সেখানে পৌঁছে মনে হল ভাগ্য আমাদের ভালো। পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘ খুব অল্প সময় আগেই সেখান দিয়ে গেছে। শুধু যায়নি, কোন একটা ভারী জিনিস টেনে নিয়ে গেছে—পায়ের দাগ খুব গভীরভাবে সেজন্য মাটিতে পড়েছে।

আর একটু এগুতেই ভারী জিনিসটা যে কি তা' বোঝা গেল। গাঁয়ের একটি বলদ লুকিয়ে বোধ হয় সকালবেলা ভুট্টা ক্ষেতে চরতে এসেছিল। চুরির শাস্তি তার হাতে হাতে মিলে গেছে। তার রক্তাক্ত মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে দেখা গেল। আশে পাশে বাঘের পায়ের দাগ। বাঘ বলদের পেট চিরে শুধু হৃৎপিণ্ডটি খেয়ে গেছে। আমরা এসে পড়ায় বোধ হয় তার আহার শেষ করতে পারেনি।

অজয়বাবু বললেন—'কিন্তু বেশীদূর এখনো যেতে পারেনি। মাটিতে রক্তটা কিরকম টাটকা দেখছেন ত' ?'

আমারও তাই মনে হল। দশজন করে লোক দুধারে বন তাড়াবার জন্য পাঠিয়ে অজয়বাবু ও আর দুজন লোক নিয়ে মাঝে যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তার সামনের জঙ্গল কিছুদূর গিয়েই পাহাড়ে শেষ হয়েছে। মনে হল—বাঘকে তাড়িয়ে কোন রকমে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেতে পারলেই বাছাধনের আর পালাবার পথ থাকবে না। অজয়বাবুরও দেখলাম উৎসাহ একটু বেড়েছে। বললেন —'আপনার ভাগ্য ভালো মশাই ; এমন কায়দায় কোনদিন বাঘকে পাওয়া যায়নি।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই ডানদিকে ক্যানাস্তারা বাজাবার শব্দ পাওয়া গেল। বোঝা গেল আমাদের লোকেরা বাঘের সন্ধান পেয়েছে। খানিক বাদেই একজন লোক দৌড়োতে দৌড়োতে এসে খবর দিলে যে, বাঘ তারা দেখতে পেয়েছে ; তাদের সাড়া পেয়ে বাঘ পাহাড়ের দিকে গেছে। বাঁ ধারের লোকেরা ধীরে ধীরে ইতিমধ্যে বন তাড়িয়ে এগিয়ে আসছিল। বাঘের চারধারে বেড় দিয়ে তাড়া দেবার আদেশ দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। যত পাহাড়ের কাছে পৌছালাম জঙ্গলও ততই পাতলা হয়ে আসছিল। পাহাড়ে জমির মাঝে মাঝে দু'একটা ঝোপ, তার ভেতর লুকোলে

অনায়াসেই বাঘকে খুঁজে বার করা যাবে। পাহাড়টা সামনে রেখে আমরা ক্রমশ বাঘের চারধারের বেড় ছোট করে আনছিলাম। বাঘকে পালাতে হলে এখন আমাদের ভেতর দিয়েই পালাতে হবে এবং এইরকম খোলা জায়গায় সেরকম ভাবে পালাতে গেলে তার নিস্তারের বিশেষ আশা নেই।

হঠাৎ আমাদের সামনের কিছু দূরের একটি ঝোপ নড়ে উঠল এবং ভীষণ গর্জন করে একটি প্রকাণ্ড বাঘ পাহাড়ের দিকে বিদ্যুতের বেগে ছুটে গেল। এখনই গুলি করতে পারতাম, কিন্তু পাহাড়ের দিকে যখন গেছে তখন পরে আরো সুবিধা হবে ভেবে আমরা তার পেছু পেছু এগিয়ে গেলাম।

সামনেই পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর ; সেখানে বাঘের লুকোবার মত একটি ঝোপও নেই। নেহাত মৃত্যু ঘনিয়েছে বলেই মনে হল বাঘ সেদিকে দৌড়েছে। আর একটু এগুবার পরই বাঘকে আবার দেখা গেল। এবার তার ভাবগতিক দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তার চারধারে যে আমরা তাকে ঘিরে তাড়া করছি তাতে যেন তার ভ্রূক্ষেপই নেই। গদাই-লস্করি চালে পাহাড়ের একটা উঁচু ঢিবির ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বন্দুকের নাগালের একটু বাইরে পড়ে বলে গুলিও আমরা ছুঁড়লাম না। খানিক বাদেই আমরা পাহাড়ের একেবারে ধারে গিয়ে পড়লাম। তিনদিকে আমাদের লোকজন, সামনে পাহাড়, বাঘকে একবার দেখা দিতেই হবে।

দেখাও মিলল। যেদিক থেকে আমরা তাড়া করছিলাম তারই সামনে পাহাড়ের খানিকটা থামের মত জায়গা। হঠাৎ বাঘটাকে সেইখানে দেখা গেল। আমাদের সামনে একটু উঁচু ঢিবি! আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে সে ঢিবিতে উঠতে গেলে কয়েক পা নেমে আবার উঠতে হয়। উঁচু ঢিবি থেকে তাড়া করবার বেশী

সুবিধে হবে জেনেও পাহাড়ের ওই জায়গা থেকে বাঘের পালাবার উপায় নেই বুঝে আমরা দ্রুতপদে একটু নেমেই সে টিবিতে উঠে পড়লাম।

কিন্তু কোথায় বাঘ ?

এক টিবি থেকে আর এক টিবিতে উঠতে মাত্র দু' সেকেণ্ড বাঘটা আমাদের চোখের আড়াল হয়েছে। এই দু' সেকেণ্ডের মধ্যে এতগুলো লোকের মাঝখান থেকে বাঘ অদৃশ্য হয়ে গেল কেমন করে !

পাহাড়ের যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল তার আশেপাশে পালাবার কোন জায়গা তার নেই। সে চেষ্টা করলে আমাদের চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়ত।

তবে ?

অজয়বাবু খানিক বাদে বললেন—'বলেছিলাম না মশাই—এ একেবারে ভোজবাজি। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।'

আজ আর হাসতে পারলাম না। তবু লোকজন নিয়ে পাহাড়ের সেই জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—যদি কোন গুহা-টুহায় বাঘ লুকিয়ে থাকে। পাহাড়ের গায়ে সামান্য দু'চারটে ফাটল ছাড়া বাঘ লুকোবার মত একটা গুহাও দেখতে পেলাম না।

সত্যিই মনে হল যেন বাঘটা আমাদের সকলের মাঝখান থেকে এক পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

এর পর আর কি করা যায় ! মাথা নীচু করে গাঁয়ে ফিরতেই হল। পথে আবার মোড়লের সঙ্গে দেখা। বললে—'কি সাহেব, বাঘ মিলল ?'

গলার স্বরে মনে হল যেন পরিহাস করছে, কিন্তু তার কথার জবাব দিতে পারলাম না।

তারপর দু'তিনদিন বাঘের আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। মরা বলদটার কাছে টঙ বসিয়ে দু' রাত্রি পাহারাও দিলাম, কিন্তু বাঘ সে দিক মাড়াল না।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা ক্রমশ আমাদের ওপর চটে উঠছে মনে হল। আমরা তাদের উপকার করতে এসেছি বলে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হল বাঘটাকে তাদের বিরুদ্ধে আমরাই যেন ক্ষেপিয়ে তুলছি।

দুদিন এমনি করে ব্যর্থ হওয়ার পর একেবারে ঘুমোতে পারলাম না। আর যে যাই ভাবুক এ বাঘ যে রক্তমাংসের জানোয়ার এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই হয়নি। তার এমন করে অন্তর্ধান হওয়ার একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা কি? সারারাত সেই চিন্তাতেই কেটে গেল।

সকালে উঠে দেখি অজয়বাবু জিনিসপত্র গুছোচ্ছেন।

বললাম—'সে কি মশাই—চললেন না কি?'

গম্ভীর হয়ে অজয়বাবু বললেন—'বাঘ শিকার করতে এসেছিলাম মশাই। ভূত-প্রেতের পেছনে দৌড়তে তো নয়।'

'ভূত-প্রেত আবার কোথা থেকে এল?'

আমার দিকে অত্যন্ত বিরক্তভাবে চেয়ে অজয়বাবু বললেন—'জেনেশুনে বোকা সাজবেন না মশাই। নিজের চক্ষে সেদিন কি দেখলেন?'

বুঝলাম এঁর সঙ্গে এবিষয়ে তর্ক করা বৃথা। তাই সেকথা বাদ দিয়ে বললাম—'আর দুটো দিন অপেক্ষা করুন, একসঙ্গেই যাব'খন।'

অজয়বাবু বললেন—'বৃথা চেষ্টা মশাই! বাঘ শিকার অনেক করেছি, কিন্তু এখানে কিছু হবে না জানি।'

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে তাঁকে দুদিন থাকতে রাজী করান গেল।

অজয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা থাকলামই না হয় তুদিন, কিন্তু কি করবেন ভেবেছেন, জানতে পারি কি ?'

'আপাততঃ গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছি।'

অজয়বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন—'ছেলেদের সাথে গল্প ! আপনার মাথা খারাপ হয়েছে !'

'বোধ হয়'—বলে তাঁর বিস্ময়ের মাত্রা আরো তু' ডিগ্রী বাড়িয়ে বেরিয়ে গেলাম।

প্রথমদিন অমনি কেটে গেল। অজয়বাবু থেকে থেকে আমার মুখের দিকে তাকান। মাঝে মাঝে বলেন—'বৃথা সময় নষ্ট !'

আমি কোন উত্তর দিই না।

দ্বিতীয় দিন সকালেই খবর পাওয়া গেল গ্রামের পূর্বদিকের গমের ক্ষেতে বাঘের পায়ের দাগ দেখা গেছে।

তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে অজয়বাবুকে বললাম—'চলুন।'

'কোথায় ?'

'সেই পাহাড়ে।'

অজয়বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—'আপনি আচ্ছা পাগল ত' মশাই ! বাঘের পায়ের দাগ পাওয়া গেল পূর্বদিকের ক্ষেতে আর আপনি যাবেন পশ্চিম দিকের পাহাড়ে ?'

হেসে বললাম—'আপনিই ত' বলেছিলেন, দক্ষিণ দিকে বাঘ খুঁজতে গেলে উভয় দিকে তাকে দেখতে পাওয়া যায়।'

তারপর তাঁর রাগ বেড়ে যাচ্ছে দেখে বললাম—'এই একটা দিন আমার কথা মত কাজ করে দেখুনই না, তারপর ত' একসঙ্গেই যাব।'

অজয়বাবু গুম হয়ে আমার সঙ্গে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে আজ আর লোকজন নেই। তুজনে অনেক দুর যাবার পর অজয়বাবু বললেন—'লোকজন কিছু নিলে হত না ?'

বললাম—'দরকার নেই।'

অজয়বাবু আর কথা বললেন না।

পাহাড়ে পৌঁছাতে বেশ বেলা হয়ে গেল। যেখানে বাঘ অন্তর্ধান করেছিল সেই পাহাড়ের থেকে ওপরে উঠে বললাম—'ভানুমতীর খেল্ আজ এখানেই শেষ।'

অজয়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন—'হুঁ' এবং পরের মুহূর্তেই আমার দিকে চেয়ে বললেন—'ওকি করছেন! পাহাড় ঠেলে ফেলবেন না কি?'

কোন কথা না বলে আমি প্রত্যেক ফাটলের কাছে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে দেখতে লাগলাম। 'না এরকম পাগলামি আর কখন দেখিনি'—বলে অজয়বাবু পাহাড়ের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট চীৎকার করে চিৎ হয়ে পড়লেন।

অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর পেছনেই যেখানটা পাহাড়ের গায়ের ফাটল বলে মনে হচ্ছিল সেখানকার একটা পাথর ঠিক মাঝখানে কবজা দেওয়া দরজার মত পেছনে হটে গেছে।

অজয়বাবুকে তাড়াতাড়ি তুলে ফেলে তাঁর হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললাম—'ভানুমতীর বাঘের সমস্যা আপনার হাত দিয়েই সমাধান হয়ে গেল অজয়বাবু!'

অজয়বাবুর তখনও বিমূঢ় ভাব কাটেনি। তিনি অবাক হয়ে বললেন—'তার মানে?'

বললাম—'এই গুপ্ত গুহাটির সন্ধানেই এখানে এসেছিলাম। দৈবাৎ আপনি বসে না পড়লে এর জন্যে কতক্ষণ খুঁজতে হত কে জানে!'

অজয়বাবু উঠে দাঁড়াতেই পাথরটা আবার সোজা হয়ে গেছল। বাইরে থেকে এখন পাহাড়ের ফাটল ছাড়া সেটা যে একটা গুহার মুখ একথা বোঝাবার কোন উপায় নেই দেখলাম। প্রকৃতির খেয়ালে

পাথরটা দু'ধারের পাহাড়ের গায়ে এমনভাবে বসেছে যে ভেতর বা বার থেকে ঠেললে ঠিক কবজার মত খুলে যায়।

বললাম—'সেদিন বাঘ এই গুহাতেই অন্তর্ধান হয়েছিল এবং এই গুহাটির সন্ধান না পাওয়ার দরুণ এ পর্যন্ত কোন শিকারী তার পাত্তা পায়নি।'

অজয়বাবু বললেন—'এখন তা' হলে কি করা যাবে?'

বললাম—'এখন ব্যাঘ্রাচার্যের ঘরে ফেরার প্রতীক্ষা এবং তারপর সংহার।'

এবার দেখলাম অজয়বাবুর অপেক্ষা করতে কোন রকম আপত্তি নেই এবং উৎসাহিত হয়ে বললেন—'একদিন হোক দুদিন হোক বাছাধনকে এখানে ফিরতেই হবে, কি বলেন?'

ভানুমতীর বাঘকে যে সেখানেই মেরেছিলাম একথা আর বিশেষ করে বলবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। ফেরবার পথে গাঁয়ের মোড়ল তার দুই ছেলেকে নিয়ে নিজে থেকে আমাদের মোট বয়ে দিয়ে গেল। দেখলাম আমাদের ওপর তার আর কোন বিদ্বেষ নেই, কিন্তু তাই বলে বাঘ মারার বাহাদুরি আমাদের দিতে সে একেবারে নারাজ। ভানুমতীর বাঘ—পূজোয় সন্তুষ্ট হয়ে নিজেই তিনি তাকে মেরেছেন—তাদের এ বিশ্বাস অটল।

অজয়বাবু আমার সঙ্গে এক গাড়িতেই উঠেছিলেন। ঘণ্টা দুই-তিন একসঙ্গে যাবার পর তিনি হঠাৎ চীৎকার করে বললেন—'বুঝতে পেরেছি মশাই, বুঝতে পেরেছি!'

অবাক হয়ে বললাম—'কি বুঝতে পেরেছেন মশাই?'

'আপনি কি করে ওই গুহার কথা জানতে পারলেন!'

'কি করে বলুন ত'!'

'গাঁয়ের ছেলেদের সাথে গল্প করে। কেমন ?'

বললাম—'ঠিক ধরেছেন। একদিন সমস্ত রাত্রি ভেবে আমার অমনিতর একটা কিছু ব্যাপার আছে বলে সন্দেহ হয়। তারপর মনে হয়, গাঁয়ের রাখাল-ছেলেরা ত' নানা জায়গায় ঘোরে; এরকম কিছু থাকলে তাদেরই কারুর না কারুর তা' জানবার কথা। অনেক বকশিস দিয়ে তাদের একজনের কাছ থেকে ওই গোপন খবরটি আদায় করি।

অজয়বাবু বললেন—'ভানুমতীর বাঘ সত্যি হলে মন্দ হত না। বাঘ শিকার ত' সবাই করে, হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এমন বাঘ শিকার করলে গল্প বলবার মত একটা কিছু হত !'

পরীরা কেন আসেনা

পরীরা আর আসে না।

জামতাড়া কি জাঞ্জিবার,—কোথাও না।

মেঘলা দুপুরে কি জ্যোছ্‌না রাত, কখ্‌খন না।

পরীরা বলতে গেলে একেবারে ফেরারী। তাদের আর পাত্তা-ই নেই। গা-ই তাদের নেই, তবু বলা যায় তারা বেমালুম গা-ঢাকা দিয়েছে।

অথচ এই সেদিন পর্যন্ত তাদের কখন না দেখা যেত, কোথায়-বা নয়!

একটু নিরালা নির্জন জায়গা পেলে ত' কথাই নেই! ঝিলের ধারে ঝাউতলা, কি বনের পারে বড় জলা গিয়েছ কি, কোন-না-কোন পরী হাজির আছে-ই!

আর পরী দেখেছ কি, অমনি বর পেয়েছ। বর দেওয়ার সম্বন্ধে তারা একেবারে মুক্তহস্ত, মানে—মুক্তকণ্ঠ। বর দেবার জন্য রীতিমত তাদের গলা সুড়্‌সুড়্‌ করছে রাতদিন।

রাজ্য, রাজকন্যে ত' কথায়-কথায়! এমন কি, হাঁচি কাশি দাঁত কনকন পর্যন্ত সারাবার বর তারা আপনা হতে, না চাইতেই দিয়ে বসে আছে।

তখন তাই ভাবনা-চিন্তা একরকম ছিল না বললেই হয়।

থাকবে কোথা থেকে?

গরীব গেরস্তের বৌ হয়ত শাশুড়ির ভয়ে ভেবে সারা—বেড়ালে মাছ খেয়ে গিয়েছে হেঁসেল থেকে, এখন দজ্জাল শাশুড়ীকে বোঝায় কি?

কিন্তু পরীরা থাকতে আবার ভাবনা !

ঠিক সময় বুঝে এক জল-পরী কোথা থেকে এসে হাজির !

কাউকে কাঁদতে দেখলে ত' আর রক্ষে নেই ! জল-পরী বর দেবার ফিকিরেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গেরস্ত-বৌ-এর চোখের জল দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—কাঁদছ কেন গা ?

গেরস্ত-বৌ হয়ত অতটা খেয়াল করেনি, কে এসেছে না এসেছে। তাছাড়া, পরীদের আসাটাও নেহাত নিঃসাড়ে আবছা রকম ত'! সে ঝঙ্কার দিয়ে বলে—আমি কাঁদছি তা' তোমার কি গা ? আমি ত' আর তোমার ছেরাদ্দের পিণ্ডি কেঁদে ভাসাইনি।

জল-পরী এবার রেগে আগুন হয়ে ওঠে ভাবছ ?

উঁহুঁ, তাদের চটানো অত সোজা নয় ! অত চট্ করে চট্‌লে তাদের চলে-ই না। একেবারে মধুর মত মিষ্টি-গলায় সে বলে—আহা, রাগ কর কেন ? আমায় বল-ই না কি তোমার দুঃখ !

গেরস্ত-বৌ এতক্ষণে জল-পরীকে চিনতে পারে। চিনতে পেরে একেবারে জিভ কেটে লজ্জায় জড়সড়, প্রথমে ত' কথাই বলবে না, তারপর জল-পরীর অনেক পেড়াপীড়িতে অনেক কষ্টে জানায় যে, তার হেঁসেল থেকে বেড়ালে মাছ চুরি করে খেয়ে গেছে। শাশুড়ী জানলে আর রক্ষে থাকবে না।

গেরস্ত-বৌ-এর মুখ থেকে কথাটা সবে খসেছে কি না,—ব্যাস্ ! জল-পরী আর সেখানে নেই। তারপর চক্ষের পাতা পড়েছে কি-না-পড়েছে, আবার সে এসে হাজির।

আর হাজির কি শুধু হাতে ?

মোটেই না। তার সঙ্গে মস্ত একটা—

—ও মা, তাইত ! সঙ্গে মস্ত একটা হুলো বেড়াল !

গেরস্ত-বৌ খানিক ফ্যাল-ফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। জল-পরীর

মুখে হাসি আর ধরে না। ভাবটা এই আর কি—কেমন, বলেছিলাম না, আমি থাকতে আর ভাবনা নেই !

পরীই হোক আর যেই হোক, গেরস্ত-বৌ তার তোয়াক্কা রাখে না। তার মেজাজ দস্তুরমত বিগড়ে গেছে ! খর-খরিয়ে উঠে বলে—বলি, কেমনতর পরী গা তুমি !

জল-পরী বেশ একটু হক্‌চকিয়ে যায়, বলে—কেন ? এইত,—মানে এইত সেই হুলো বেড়াল, যে তোমার হেঁসেলের মাছ খেয়েছে !

—তা' আমি কি ওই হুলো বেড়াল ভেজে শাশুড়ীকে দেখাব ? খেঁকিয়ে ওঠে দুখিনী গেরস্ত-বৌ।

জল-পরী একেবারে অপ্রস্তুত।—তাইত ! তাইত ! বড় ভুল হয়ে গেছে ! বলে,—তৎক্ষণাৎ সে আবার উধাও।

ছাড়া পেয়ে হুলো বেড়াল তখন আড়াই-পা গেছে কি না-গেছে, জল-পরী মস্ত বড় এক মাছ—জলজ্যান্ত, জলের মাছ নিয়ে এসে হাজির।

সে মাছ নিয়েও কম ফ্যাসাদ নয় !

মাছ বোলে মাছ ! সে মাছে অমন দশটা গেরস্তের জ্ঞাতি-ভোজন হয়ে যায় !

এত-বড় মাছ নিয়ে গেরস্ত-বৌ এখন করে কি ?

যাই করুক, আমাদের এখন তা ভাবলে চলবে না। আমাদের এখন আসল কথাই বাকি।

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম, পরীরা আসে না। আসে না আজ অনেক দিন।

পরীদের শেষ আবির্ভাবের তারিখ হল ১৮-ই অগ্রহায়ণ ১১১৯ সাল। এখানে অবশ্য জানিয়ে রাখা ভাল যে, এই তারিখ নিয়ে সামান্য একটু মতভেদ পণ্ডিত-মহলে আছে। বিশ্ববার্তা-সংগ্রহের

সম্পাদকের মতে পরীদের শেষ আবির্ভাব ঘটে, ৭ই অগ্রহায়ণ ১১১৯ সাল। সাল ও মাস সম্বন্ধে কোন আপত্তি না করলেও, বিজ্ঞান-কল্পতরুর রচয়িতা—বিশ্ববার্তা-সংগ্রহের দেওয়া তারিখ সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে মনে করেন। তাঁর মতে পরীরা শেষ পৃথিবীতে দেখা দেয়, ৭ই নয়, ১১ই অগ্রহায়ণ ১১১৯ সাল।

বিশ্ববার্তা-সংগ্রহের ও বিজ্ঞান-কল্পতরুর মধ্যে এই তারিখের তর্ক নিয়ে দু' বৎসর ধরে যা-যা লেখা হয়েছিল এবং পরে এই তর্ক মানহানির মোকদ্দমায় গড়ালে তাতে উভয় পক্ষ থেকে যা-যা জেরা ও জবানবন্দীতে বলা হয়েছিল, সমস্ত পর্যালোচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তই করেছি যে, ৭ এবং ১১, এই দুই তারিখ নিয়ে যে গোলযোগ, তা এই তারিখ দুটি যোগ করে দিলেই মীমাংসা হয়ে যায়। কারুরই তখন কিছু আপত্তি করবার থাকে না এবং আপত্তি করলেই-বা শুনছে কে ?

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ১৮ই অগ্রহায়ণ ১১১৯ সালেই সর্ববাদি-সম্মতরূপে শেষ-পরী শেষবার পৃথিবীতে দেখা দেয়। কোথায় দেখা দেয় জানো ? বিষমগড় রাজ্যের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান-বাটিকায় যুবরাজ পরম ভট্টারক শ্রীশ্রীধুরন্ধররাম ধনুষ্টঙ্কারের সামনে।

পরীর আবির্ভাবের কাহিনী সুরু করবার আগে বিষমগড় রাজ্যের একটু বর্ণনা বোধহয় করা দরকার।

বিষমগড় রাজ্যটি হল ঠিক রামখেলখণ্ড রাজ্যের দক্ষিণে। রামখেলখণ্ড রাজ্যটি কোথায়, যদি না জানা থাকে, তাহলে অবশ্য আমি নাচার ! তবে নিতান্ত অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞদের জন্যে বিষমগড় রাজ্যের একটি চৌহদ্দি এখানে দিয়ে দেওয়া হল।

বিষমগড় রাজ্যের দক্ষিণে বিরাট মরুভূমি। তার পূর্বদিকে এক বিশাল তৃণপাদপ-হীন বালুকাময় প্রদেশ, তার পশ্চিমে যতদূর দেখা

যায়—শুধু, বন্ধ্যা বালির সমুদ্র এবং তার উত্তরে · ওঃ! উত্তরে—রামখেলখণ্ড বুঝি আগেই বলেছি? তা যাই বলে থাকি, রামখেলখণ্ড আসলে এমন একটি জায়গা—যেখানে কি আকাশে, কি নীচে, কোথাও জলের বাষ্পটি নেই। সেখানে না জন্মায় কিছু, না থাকে জন-মনিষ্যি। সত্যি কথা বলতে কি, রামখেলখণ্ডকে মরুভূমি বলে কেউ বর্ণনা করলে তার নামে মামলা আনা যায় না।

বিষমগড় রাজ্যের চারিধার যেমন সরস, সে রাজ্যের বাসিন্দাদের ভেতরটাও প্রায় তাই। তারা খায় দুবেলা দুমুঠো ভুট্টার দানা, আর চেনে শুধু সোনা। সে সোনা তাদের মাঠে ফলে না; তবু সিন্দুকে কেমন করে জমা হয়, সেইটেই তাজ্জব ব্যাপার!

এই সোনা-সর্বস্ব দেশের মধ্যে সবচেয়ে সোনা-সেয়ানা হলেন, কুমার শ্রীশ্রী ইত্যাদি ধুরন্ধর ইত্যাদি। এই কুমার ধুরন্ধরের সামনেই ১১১৯ সালের অগ্রহায়ণের স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে শেষ-পরীর আবির্ভাব। তখন অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণাভ কিরণে আকাশ পৃথিবীর,—মানে,—যা-যা হবার হয়েছে, বাগানের ফুলের গন্ধ নিয়ে বাতাস যা-যা করবার করেছে, এবং সাধারণতঃ এ-রকম সময় আর যা-যা ঘটে থাকে, সবই ঘটেছে।

কুমার ধুরন্ধর তন্ময় হয়ে সূর্যাস্তের আলোয় রঙীন একটি মেঘের দিকে চেয়ে ছিলেন। (কেন চেয়েছিলেন সেটা পরে প্রকাশ পাবে) হঠাৎ কাছেই মধুর গলায় তাঁর নাম উচ্চারিত হতে শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখেন এক পরী।

এমন পরী দেখা কিছু অদ্ভুত নয়, কিন্তু এ পরী আবার ডাকলে—কুমার ধুরন্ধর!

বোঝা গেল, পরী কুমারকে চিনে ফেলেছে। চিনে ফেলাটা সত্যিই অবশ্য আশ্চর্য! কারণ, চেহারা দেখে ধুরন্ধরকে রাজকুমার

বলে সন্দেহ করা অত্যন্ত কঠিন,—প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। মাথায় কেলে-হাঁড়ি ঝোলানো সগাঁঠ এবং সুদীর্ঘ একটি বংশদণ্ড, মাথা না তিনি,—দেহ-সৌষ্ঠবে কে যে শ্রেষ্ঠ, তা বলা যায় না। তার ওপরে তাঁর একটি পা একটু খোঁড়া ও একটি চোখ কানা।

পরীদের সেই প্রচণ্ড প্রাদুর্ভাবের দিনে এ-হেন পেটেণ্ট চেহারা কেমন করে যে পরীদের নজর ও বর বাঁচিয়ে এতদিন তিনি মজুত রেখেছেন, তা ভাবলে অবাক হবারই কথা। তবে শোনা যায়, দশ মাসের জায়গায় আট মাসেই ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পরীরা গোড়াতেই তাঁর পাত্তা পায়নি। তারপর থেকে একটু জ্ঞান হতেই তিনিও তাদের আমল দেননি। প্রথমতঃ বিষমগড়ের রাজা অর্থাৎ তাঁর বাবার খেয়ালে কুমার ধুরন্ধর ছেলেবেলা থেকে দেশ-দেশান্তরে ঘুরেই বেড়িয়েছেন এতদিন। সৌরাষ্ট্রের পরীরা তাঁর সন্ধান পেতে-না-পেতেই তিনি ঠিকানা বদলে গেছেন কোশলে, আর কোশলের পরীরা বাড়ি ঘেরাও করতে এসে দেখেছে,তিনি বাসা তুলে নিয়ে গেছেন কপিশায়।

এরকম ঘনঘন ঠিকানা বদলের মূল অবশ্য কুমারের বাবা, স্বয়ং বিষমগড়ের রাজা। মন্দ লোক বলে যে, বাড়িভাড়া ফাঁকি দেবার জন্যেই না কি তাঁর এই ফিকির। দেশে থাকলে রাজার উপযুক্ত ঘটা করে থাকতে যে খরচটা হ'ত, বিদেশে বেনামীতে থাকার দরুণ সেটা ত' বেঁচে যায়ই, তার ওপর বাড়িভাড়াটা ফাঁকি দিতে পারলে সোনায় সোহাগা! মন্দ লোকের এসব কথা অবশ্য কানে না তোলাই উচিত। আমরা যতদূর জানি, ছেলেকে গোড়া থেকে দেশ-বিদেশের ব্যবসা-বুদ্ধিতে পাকা করবার জন্যেই বিষমগড়ের রাজার এই বন্দোবস্ত।

এতসব বাধা সত্ত্বেও দু'একটা উট্‌কো পরী কখনো কখনো কুমার ধুরন্ধরকে আচম্‌কা ধরে যে না ফেলেছে এমন নয়, কিন্তু কুমারকে

কায়দা করতে পারেনি কেউ। ছেলেবেলা থেকেই ধুরন্ধরের কেমন পরী টরীর ওপর কোন প্রীতি নেই। আর-সব ছেলে যখন খেলার নেশায় পরীদের সঙ্গে মেঘের দেশে উধাও হয়ে গিয়েছে, তখন কুমার ধুরন্ধর ঘরের কোণে বসে-বসে নামতা মুখস্থ করেছেন চক্র-বৃদ্ধি সুদের। পরীরা পরিচয় করতে এসে ধমক খেয়ে গেছে ফিরে। বহুদিন বাদে দেশে ফেরবার পর আজ এই প্রথম তাঁর পরীর হাতে পড়া।

আজকেও পরী বলে চেনামাত্র ধুরন্ধরের মুখের চেহারা যা হয়ে ওঠে—তাতে সে বেচারীর বুক শুকিয়ে যায়। কিন্তু তারও আজ বড় দায়। সারা বেলাটা একদম বরবাদ গেছে। কাউকে বর দেবার সুযোগ মেলেনি। সেই দুঃখেই, গতিক বিশেষ সুবিধের নয় বুঝেও, চট্ করে সে 'উবে' যেতে পারেনা। কোন রকমে সাহস করে দাঁড়িয়ে থেকে আপ্যায়িত করবার চেষ্টায় হেসে বলে—আপনি মেঘের বাহার দেখছিলেন বুঝি!

—দেখছিলাম তা হয়েছে কি?—খেঁকিয়ে ওঠেন ধুরন্ধর।—মেঘের বাহার বুঝি আমাদের দেখতে নেই? ওরকম একখানা মেঘে পাড় বসাতে ক'ভরি সোনার জরি লাগে কষে বলুন দেখি, কে কেমন ওস্তাদ দেখি!

আস্ফালনটা করে ফেলার পর ধুরন্ধরের বোধহয় খেয়াল হয়, সামান্য একটা পরীর কাছে এ-সব গভীর কথার কোন কদর নেই! ধমক দিয়ে তাই তিনি বলেন—কিন্তু তুমি এখানে কি মনে করে এসেছ বাপু?

পরী থতমত খেয়ে একটু শুক্‌নো-হাসি হেসে বলে—আমি সন্ধ্যাপরী। আপনার যদি কোন বর-টর দরকার থাকে—ধুরন্ধরের ধমকে পরীকে আর কথা শেষ করতে হয় না;—যাও—যাও—যাও

—যাও! ওসব বর-টর নিয়ে আমার কাছে সুবিধে হবে না। সরে পড়ে এইবেলা।

সন্ধ্যাপরী তবু একেবারে আশা ছাড়ে না। মিনতি করে বলে—কিন্তু দেখুন, এই আপনার চেহারা···

—কেন, আমার চেহারাটা কি খারাপ?—বাঁকা-সুরে জিজ্ঞাসা করেন ধুরন্ধর।

অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে সন্ধ্যাপরী আমতা-আমতা করে বলে—না, তা ঠিক নয়, মানে কি না····

—থাক আর অত ঢোক গিলতে হবে না। আমার চেহারার ছিরি কি আর আমি জানি না? কিন্তু এ চেহারা বদলাব কেন বল ত' বাপু! বদলে আমার লাভ?

এমন কথা পরী তার পাখার জন্মে শোনেনি। সে একেবারে থ' হয়ে যায়।

ধুরন্ধর বলে চলেন—তুমি বর দিয়ে আমার চেহারাটি ভালো করে দিতে চাও এই ত'। কিন্তু ভালো চেহারার ফ্যাসাদ কি জানো? এমন নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে নিজের ব্যবসা তাহলে আর করতে হবে না। আজ অমুক রাজকুমারীর উদ্যান-সভা, কাল অমুক রাজার সঙ্গে নৌকা-বিহার, এখানে নেমন্তন্ন, ওখানে বৈঠক—সবার ভালবাসার টানাটানিতে প্রাণ একেবারে যায় আর কি! চেহারা এমন বলেই না কেউ আর কাছে ঘেঁসে না! উঁহু বাপু, এ চেহারা আমি লাখ টাকাতেও বদলাচ্ছি না! সন্ধ্যাপরী হতাশ ভাবে শেষ চেষ্টা করে বলে—তাহলে, আর কোন বর?

—কি বিরক্ত কর বল ত' তোমরা!—রীতিমত চটে ওঠেন কুমার ধুরন্ধর—ক'টা বর তোমরা দিতে পার? কী বর? দুনিয়ার সেরা চুনি, চুনারের আঞ্জনী আমায় এখুনি এনে দিতে পার?

সন্ধ্যাপরী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলে—এনে দিতে পারতাম, কিন্তু এইমাত্র আর এক পরী সেটা মদ্র-দেশের এক ময়রাকে বর দিয়ে ফেলেছে। এখন সেটা টানাটানি করতে গেলে, মাঝখানেই আট্‌কে যাবে, কারুর কাছে পৌঁছাবে না। এসব হীরে-জহরতের দোষই এই! সবাই রাতদিন টানা-হ্যাঁচড়া করছে।

কুমার ধুরন্ধর দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন—থাক থাক! ওসব বক্তৃতা আর শুনতে চাই না। মুরোদ যে তোমাদের কত, তা বোঝা গেছে!

মুখখানি কাঁচু-মাচু করে সন্ধ্যাপরী বলে—কিন্তু আর কিছু যদি চান, তাহলে আপনাকে তিন-তিনটে ইচ্ছে…

ধুরন্ধর ইতিমধ্যে কি যেন ভেবে নেন। তাঁর কোটরে-ঢোকা ক্ষুদে চোখটি যেন চক্‌ চক্‌ করে ওঠে। অত্যন্ত প্যাঁচালো এক হাসি হেসে ধুরন্ধর বলেন—তিন-তিনটে বর দিতে পার?

ভালো-মানুষ পরী অত-শত হাসির মর্ম বোঝে না; খুশী হয়ে বলে—নিশ্চয়ই! তিনটে বর দিতে পারি এখুনি।

—হুঁ!—ধুরন্ধর খানিক পায়চারি করে বলেন—আচ্ছা, বল দেখি, সমতটে সোনামুগের ভাও এখন কত?

সন্ধ্যাপরী সাধুভাষায় যাকে বলে, ভ্যাবাচ্যাকা!

এমন বর কেউ কখনো ত্রিভুবনে শুনেছে! হতভম্ব হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে—কি বললেন?

—কেন, এই সহজ কথাটা আর বুঝতে পারলে না!—

ধুরন্ধর হেঁকে ওঠেন—বলছি, সমতটে সোনামুগের দর কত? সৌরাষ্ট্রের ব্যাপারীদের কাছে ধর যদি এখন বায়না নিই, সঠিক দরটা জানা থাকলে, সুবিধে কি কমখানি!

—কিন্তু এরকম বর ত' হয় না!—সন্ধ্যাপরী কাতরভাবে জানায়।

—হয় না কিরকম ! বাঁকা নাক সোজা হয়, কানা চোখ ভালো হয়, আর সোনামুগের দর ঠিক হয় না ! আলবৎ হয় !—ধুরন্ধরের চোখ রাঙা হয়ে ওঠে—অবশ্য একটিমাত্র চোখ।

সন্ধ্যাপরী নিরুপায়। কি কষ্টে ধুরন্ধরের বায়না তাকে যে মিটোতে হয়, সেই জানে ! এ-বর দান করে তাকে রীতিমত হাঁপাতে হয়।

কিন্তু ধুরন্ধরের কি তা বলে দয়া-মায়া আছে ! তাঁর উৎসাহ এখন দেখে কে ? এক গাল হেসে বলেন—এবার আমার দ্বিতীয় বর, কেমন ? আচ্ছা বল ত' বাপু—

তের টঙ্কা মন সাচ্চা,
ভেজাল সেরে সতেরো কাঁচ্চা।
যায় নৌকায়,
মণে ছটাক কলসীতে খায় !
কেরায়া যোজনে আধ পণ,
যায় দু' কুড়ি সাত যোজন।
কোটালের ঘুষ গণ্ডায় তিন কাক
বাটখারায় টানি, সেরে ছটাক।
কি দরে বেচে ঘি,
কাহনে তের পর্ণ গুণে নি !

সন্ধ্যাপরী এবার কেঁদে ফেলে আর কি ! বলে—এ বর কিছুতেই সই নয়। কিন্তু ধুরন্ধরও না-ছোড়-বান্দা !

সন্ধ্যাপরীকে এ বরও দিতে হয়। উড়ে যাওয়া ত' দূরের কথা, তার আর বুঝি দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই।

নেহাৎ মরণ নেই বলেই বুঝি ঠোঁটের ডগায় তার প্রাণটি এসে ঠেকে থাকে।

কুমার ধুরন্ধর ধনুষ্টঙ্কার খুশী হয়ে বলেন—যাক, খুব একটা হাঙ্গাম

ঘুচল। এই হিসেব নিয়ে তেরজন সরকার আজ তিনদিন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

—নিন শেষ বর চেয়ে, তারপর এবার আমায় রেহাই দিন। করুণ স্বরে মিনতি করে পরী।

এই যে দিচ্ছি!—বলে ধুরন্ধর হেসে ওঠেন। তারপর বলেন—

বরের হোক এমনি গুণ
যত পেলাম পাই তার তিনগুণ!

সন্ধ্যাপরী একেবারে আঁৎকে উঠে বলে—তার মানে?

—তার মানে, যত বর পেয়েছি, এখন তার তিনগুণ, অর্থাৎ তিন-তিরিক্কে ন'টি বর আমার পাওনা। এই আমার তিনের ইচ্ছে!

—কখ্‌খনো না। কিছুতে না! এ আপনার জুয়াচুরি!—নেহাত প্রাণের দায়েই সন্ধ্যাপরী উঠে দাঁড়ায়!

ধুরন্ধর হেসে বললেন—জুয়াচুরি নয়গো জুয়াচুরি নয়, এরই নাম ব্যবসাদারী! তোমাদের এত গুণ আগে কি বুঝেছি! এখন চল দেখি, খাতায় হিসেবটা লিখিয়ে ফেলিগে। বর ফুরোবার আগেই আবার বাড়িয়ে নিতে না ভুলে যাই!

তারপর বিষমগড়ের রাজকুমারের ব্যবসা দিন দিন যেমন ফেঁপে ওঠে, সন্ধ্যাপরীর দুঃখের তেমনি আর সীমা থাকে না। দিনরাত নিজের কথার ফাঁদে, ধুরন্ধরের সেই কারবারী গদিতে সে বন্দী। এক দফা বর ফুরোতে-না-ফুরোতে কুমার ধুরন্ধর তিন দফা বর বাড়িয়ে নেন—সন্ধ্যাপরীর ছুটি পাবার আশা অনেক দিন আগেই ঘুচে গেছে।

সন্ধ্যাপরী কোনদিন যদি মিনতি করে ছুটি চায়, কুমার ধুরন্ধর অমনি সরকারকে খাতা খুলে হিসেব দেখতে বলেন।

—দেখ ত' সরকার, সন্ধ্যাপরীর হিসেবটা! সরকারমশাই খাতা খুলে পড়েন,—জমা ২১০৬৮১, খরচ ১৭১৯৮।

কুমার ধুরন্ধর একটু হেসে বলেন—এখনো যে অনেক বর বাকি! এ হিসেবটা চুকে যাক্ আগে, তারপর ত' ছুটি!

সন্ধ্যাপরী জানে, এ হিসেব আর কোনদিন চুকে যাবার নয়। মনের দুঃখে তার কাচবরণ রূপে কান্নার চিড় ধরে, তার সোনালি পাখায় পড়ে পেতলের কলঙ্ক।

এমনি করেই দিন হয়ত যেত। ধুরন্ধর ধনুষ্টঙ্কারের কারবারের ভেতর গোটা দুনিয়াটাই বাঁধা পড়ে যেত। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ এক কাণ্ড যায় ঘটে।

সন্ধ্যাপরী তখন প্রায় সব আশাই ছেড়েছে। সারাদিন ব্যবসাদারী হিসেব আর দেশ-বিদেশের বাজারদর কষে তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্—চোখে সরষে ফুল!

ধুরন্ধর কিন্তু সারাদিনের লাভের হিসেব নিয়ে তখনও মশ্‌গুল!

নেহাৎ মরিয়া হয়েই পরী শেষবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। কাঁদুনিতে কিছু হবার নয় সে বুঝেছে!

—আচ্ছা, তোমার প্রাণে কি একটু সখও নেই! আমোদ, আহ্লাদ, স্ফূর্তি—কিছু না! লাভের সোনা ত' থাকে সিন্দুকে, চোখেও দেখতে পাও না; শুধু খাতার হিসেব দেখেই সুখ!

ধুরন্ধর ধনুষ্টঙ্কার এক গাল হেসে বলেন—কি সুখ তা যদি বুঝতে! ইচ্ছে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই স্বপনই দেখি…

—অ্যাঁ! সন্ধ্যাপরী হঠাৎ চমকে উঠে। তারপর হাঁ করবার আগেই বলে দেয় তথাস্তু!

পরের দিন সকালে চাকর-বাকর গদি-ঘরে এসে দেখে কুমার শ্রীশ্রী ইত্যাদি, ধুরন্ধর ইত্যাদি হিসেবের খাতা বুকে করে হাসিমুখে ঘুমোচ্ছেন। সে ঘুম আজও তার ভাঙেনি।

আর সন্ধ্যাপরী ? সে আর সেখানে একদণ্ড থাকে !

পরী মুল্লুকে সেই যে সন্ধ্যাপরী ফিরে গেছে, তারপর থেকে কোথাও কোন পরী আর মানুষের ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। সাহস করে না বোধ হয়।

সত্যি, পরীরা আর আসে না !

ক্ল

হারুর হঠাৎ হল কি ?

কদিন ধরে তাকে আর দলে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদেরও সব মজা প্রায় মাটি।

হারু হল আমাদের সর্দার। সে না হলে কোন খেলাই জমে না। আমাদের তিন হাত চওড়া গলিতে ক্যাম্বিশের বল নিয়ে ফুটবল খেলতেও সে না হলে চলে না, রাত্তিরবেলা আমাদের গলির পোড়ো বাগান-বাড়িটায় লুকোচুরি খেলতেও সে না থাকলে কারুর সাহসে কুলোয় না। পাড়ার সমস্ত ওয়ারিশ বেওয়ারিশ কুকুর জড় করে গলায় নম্বর বেঁধে ঘোড়দৌড় করবার কল্পনা সে ছাড়া আর কার মাথা থেকে বেরোয় !

সেই হারুর হল কি ? কদিন থেকে বড় যেন গম্ভীর। আমাদের কাছেই ঘেঁসে না। দেখা পাওয়াই শক্ত। পেলেও বোঝা যায় কি এক গভীর চিন্তায় সে নিমগ্ন। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবার সময় নেই।

না, এটা ঠিক বৈরাগ্য গোঁছের কিছু নয়। ক্লাশে সে ঠিকই উঠেছে, বাড়িতে বকুনিও কিছুর জন্যে খায়নি। বাড়ির একমাত্র আদুরে ছেলে, বকুনি সে কখনো খায় না বললেই হয়। কি যে হারুর হয়েছে দুদিন বাদে একটু যেন আঁচ পাওয়া গেল। শনিবার দুপুরবেলা ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় জোর করে হারুর সঙ্গ নিয়েছি, তার ঔদাসীন্য অগ্রাহ্য করে।

—চোর পুলিশ খেলবি আজ ! একবার গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসাও করেছি।

—চোর পুলিশ! হারু এমনভাবে একটু হেসেছে যেন এসব ছেলেমানুষী খেলার সে অনেক ওপরে।

খানিক বাদেই কিন্তু তার রহস্য খানিকটা ধরা পড়ল।

গলিতে ঢোকবার মুখেই হঠাৎ দেখি সে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

—ওকি! দাঁড়ালি কেন, চল!

—চুপ! ভাবতে দে।

রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ভাববার কি হল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—ভাববার হঠাৎ হল কি!

—কি হল? এইমাত্র যে লোকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল তাকে লক্ষ্য করেছিস্?

—লক্ষ্য করব! কেন?—আমি সবিস্ময়ে বললাম—ও ত' ফিরিওয়ালা একটা। প্রায় এ পাড়ায় শাড়ী ধুতি বোম্বাই চাদর ফিরি করতে আসে!

—হুঁ তা' ত' আসবেই! সেই জন্যেই ওর গায়ে ইচ্ছে করে ধাক্কা লাগালাম!

বোঁচকা ঘাড়ে ফিরিওয়ালার সঙ্গে সখ করে ধাক্কা লাগাবার সুখটা যে কি, কিছু বুঝতে না পেরে থ' হয়ে গেলাম।

করুণা করে হারুই এবার একটু ব্যাখ্যা করে দিলে—ধাক্কা লাগতেই লোকটার চাউনিটা কি রকম হল দেখলি!

—দেখলাম ত'! প্রায় মারে আর কি!

—ওইত! হারু গর্বের হাসি হেসে বললে, তোদের এখনো চোখই তৈরি হয়নি। সকলের হয় না। খুঁটিনাটি অনেক কিছু একবার চেয়েই যদি ধরা না যায় তাহলে চোখ কিসের!

—তোর চোখে কি ধরা পড়ল শুনি?—আমার প্রশ্নটা খুব প্রসন্ন সুরে বেরুল না।

হারুর সেই বিজ্ঞের হাসি—লোকটা ফিরিওয়ালা নয়।

—ফিরিওয়ালা নয় ত' কি ?—আমি অবাক।

—কোন রাজ্যের গুপ্তচর। এখানকার সব বড় বড় ঘাঁটির ফটো তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। ধাক্কা দিয়েই বুঝলাম কি একটা শক্ত জিনিস পুঁটলির মধ্যে রয়েছে। সেটা ক্যামেরা।

একসঙ্গে এতগুলো রহস্যে একটু দিশাহারা হয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম—কিন্তু আমাদের এ গলিতে কেন ? এখানে আবার বড় ঘাঁটি কোথায় ?

হারু অবজ্ঞা ভরে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই মনে করল না এ বাজে প্রশ্নের।

হারুর দল ছাড়ার রহস্য তার পরদিনই পরিষ্কার হল। হারুর অনেক বিদ্যার কথা জানা ছিল, সে যে একজন গোয়েন্দা এই খবর শুধু পাইনি।

খবরটা হারুর কাছেই পেলাম অবশ্য। আমাকে সাকরেদ করতে স্বীকার করে অত্যন্ত গোপনে সে ব্যাপারটা আমায় জানালে। গোয়েন্দা হবার জন্যে অনেককাল ধরেই সে নাকি সাধনা করেছে লুকিয়ে। এইবার তার কাজে নামবার পালা।

হারু গোয়েন্দা হওয়ার ফলে দিনগুলো প্রথম নেহাৎ মন্দ কাটতে লাগল না।

আমাদের নিতান্ত নগণ্য বেচু পরামাণিকের গলির ভেতর এত রহস্য রোমাঞ্চ লুকিয়ে ছিল কে জানত !

আমাদের গোয়েন্দার দপ্তর দিন-দিনই মোটা হয়ে উঠতে লাগল। আর রহস্যজনক জিনিসের সংগ্রহের ত' কথাই নেই। হারুর মার কাছে কাকুতি মিনতি করে চেয়ে আনা হাত-বাক্সে আর কুলোয় না। জিনিসই কত রকমারি। হারু ত' কিছুই ফেলবার পাত্র নয়।

পুরোণ ক'টা ছেঁড়া হ্যাণ্ডবিল, কার একপাটি ছেঁড়া জুতো, মরচে ধরা একটা ভাঙা চাবি, শেষকালে খালি দেশলাইএর বাক্স পর্যন্ত।

খালি দেশলাইএর বাক্সটায় আমি মৃদু আপত্তি জানাতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলাম।

—তুই এসবের কি বুঝিস? কিসে যে কি কাজ হয় কে বলতে পারে। এই খালি দেশলাইএর বাক্স থেকে একটা খুনের কিনারা হয়ে যেতে পারে, জানিস্?

সভয়ে নিবেদন করেছিলাম—কিন্তু খুনটা ত' আগে হওয়া দরকার! এ অঞ্চলে কোথাও কোন খুনোখুনির খবর ত' কই পাওয়া যায়নি।

কিন্তু হারু সামান্য একটা খুনের অভাবে হার মানবার পাত্র নয়। তৎক্ষণাৎ খিঁচিয়ে উঠেছিল আমায়—খবর পাওয়া যায় নি ত' হয়েছে কি? খবর কি সব আগে পাওয়া যায়! তা ছাড়া বদমায়েসরা খুন জখম করবার ঢের আগে থেকে ফন্দি আঁটে, তা জানিস! সেই ফন্দিটা ধরতে পারাই হল বাহাদুরী।

আর কিছু বলা নিরাপদ নয় জানা সত্বেও মুখ থেকে ফস্কে বেরিয়ে গেছল—কিন্তু ওই দেশলাইএর বাক্সটায় খুনোখুনির কোন ফন্দি আছে কি? খানিক আগে হাবুলের বাবাকেই ওটা ফেলে দিতে দেখলাম যে!

হাবুলের বাবা পাড়ার নেহাৎ নিরীহ বৃদ্ধ ভদ্রলোক। দু' পায়ে গেঁটে বাত বলে নিজের বাড়ির রক থেকে বড় নামেন না।

হারু এক সেকেণ্ডের জন্যে গুম্ হয়ে গিয়ে তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। তারপর—অত যদি আমার ওপর অবিশ্বাস, আমার সঙ্গে থাকবার দরকার কি? গোয়েন্দাগিরি যার তার কর্ম নয়।

এরপর হারুকে আর ঘাঁটাবার সাহস হয়নি। ওর কথাই নির্বিবাদে মেনে তার সাকরেদি করে চলেছি।

ইস্কুলের ছুটির পর ফুটবলের মাঠটার দিকে মনটা ছুটলেও সে কথা ঘুণাক্ষরে হারুকে জানতে দিই না।

হারু এখন ওসব তুচ্ছ ছেলেমানুষী খেলাধূলোর অনেক ওপরে। সারা বিকেলটা হারুর সঙ্গে সঙ্গে রোদে ঘুরে বেড়াতে হয়, অনেক কিছুর ওপর নজর রাখতে, আর যাকে বলে ক্লু সংগ্রহ করতে। ক্লু কথাটা হারুর কাছে শিখেছি। কোথায় কি হচ্ছে বা হবে তার হদিস্ দেবার টুকিটাকি হল ক্লু। আর এই ক্লু চেনাতেই নাকি গোয়েন্দাদের বাহাদুরী!

ক্লু চেনা যে কত শক্ত হারুর সঙ্গে ঘুরে তা' পদে পদেই টের পাই। রাস্তার ধারে খানিকটা সিগারেটের বাক্সের ভেতরকার রাঙতা পড়ে আছে হয়ত। হারু সেটা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেয়। ঝাঁপিয়ে পড়ার মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ধারে কাছে সেটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবার মত কোন লোকই নেই। তবু ক্লু সংগ্রহ করতে ওই রকম ঝাঁপিয়ে পড়াই বোধ হয় নিয়ম।

রাঙতাটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে হারু সেটা আমার হাতে দিয়ে হুকুম করে—নে, রাখ।

ক্লু বইবার ভার আমার ওপর। ক্লু হিসেবে রাংতার দামটা যে কি সে বিষয়ে একটা বেয়াড়া প্রশ্ন জিভের ডগা পর্যন্ত এগিয়ে এলেও ঢোক গিলে আবার সেটাকে নামিয়ে দিয়ে রাঙতাটা থলিতে চালান করি। হ্যাঁ, থলি একটা সঙ্গে থাকে, আর থলিটা প্রায় প্রতিদিনই ছেঁড়বার উপক্রম।

কিন্তু তার পরই আমার গোয়েন্দাগিরি প্রায় শেষ হবার জোগাড়।

হঠাৎ মোক্ষম একটা ক্লু পেয়ে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়ি রাস্তার ওপরে।

রাঙতাটা যা থকে বেরিয়েছে সিগারেটের সেই খালি বাক্সটাই পেয়ে গেছি!

সাগ্রহে সেটাকে তুলে ধরে, যতরকমে সম্ভব সেটা পরীক্ষা করে দেখি। মায় শুঁকে পর্যন্ত। এটা হারুর ওপর একটু টেক্কা দেওয়া। রাঙতার বেলা শুঁকে দেখাটা হারুর বাদ ছিল।

পরীক্ষা শেষ করে সগর্বে খুশি মনে বাক্সটা থলিতে ভরতে যাচ্ছি হঠাৎ হারু বলে ওঠে—"ওটা কি হচ্ছে কি?"

হারুর বলার ধরণটা আমার ভালো লাগে না, কটমট করে তার তাকাবার ধরণটাও।

—কেন? ক্লু রাখছি!

—দেখি। বলে হারু তাচ্ছিল্য ভরে হাত বাড়ায়।

মূল্যবান ক্লুটা অমন তাচ্ছিল্য ভরে নেওয়াটা আমার পছন্দ হয় না। তবু তার পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

নিতান্ত অবজ্ঞাভরে একবার হাতে নিয়ে দেখেই হারু সেটা ফেলে দেয়।

আমার বিদ্রোহও ফেটে বেরোয়—ফেলে দিলে যে!

—দিলাম ওটা কিছু নয় বলে! হারু নির্বিকার।

তোমার রাঙতাটা ক্লু, আর আমার সিগারেটের বাক্সটা কিছু নয়! আমি বেপরোয়া বলে ফেলি।

হারু বিজ্ঞের মত একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসে।—ক্লু চেনা যদি অত সহজ হ'ত, তাহলে সবাই গোয়েন্দা হতে পারত, বুঝেছিস!

তাহলে তুমি একলাই গোয়েন্দা হয়ে থাকো, আমার দরকার নেই। মরিয়া হয়ে এতবড় কথাটা বলে থলেটা তার সামনে ফেলে দিয়ে হন হন করে চলে যাই।

কত দূর যেতাম.বলতে পারি না। গলির শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়। কিন্তু অতদূর যেতে হয় না। আমার পা ফেলার তালটা খুব বেশী ঢিমে হবার আগেই হারুর ডাক শোনা যায়।

—শোন।

এ ডাক অবহেলা করে আর একটা ডাকের আশায় এগিয়ে যাওয়া যায় আর একটু। কিন্তু তারচেয়ে মান থাকতে ফেরাই ভালো। গুটি গুটি ফিরেই আসি।

—কি? ডাকলি কেন? গলাটা যথাসম্ভব কড়া-ই রাখি।

—হুঁঃ—হারুরও একেবারে নুইলে চলে না—ঠর ঠর করে চলেই গেলি যে বড়!

—যাব না ত' কি করব! আমার 'ক্লু' যখন কিছু নয়, আমি গোয়েন্দাগিরির কিছু বুঝি না যখন, তখন কি দরকার আমার, তোমার থলি বইবার!

হারুর আর একবার নাকী অব্যয় শব্দ—হুঁঃ! গোয়েন্দা হতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, বুঝেছিস? চট করে চটলেই হয় না। আমি তোকে তাই পরীক্ষা করছিলাম।

—পরীক্ষা?

—হ্যাঁ, কতরকম পরি,—পরি—

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি—পরি? গোয়েন্দাগিরিতে পরি আবার কোথা থেকে এল?

—আহা পরি নয়। হারু বিরক্ত হয়ে বলে—বলছিলাম কি পরিস্থা,—না, না—কি বলে যে, বল না!

—পরিস্থিতি ? বাঙলায় আমার দখল যে বেশী তার প্রমাণ দিই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কতরকম পরিস্থিতি হতে পারে। চটে উঠলেই গোয়েন্দা-গিরি খতম। তাই দেখছিলাম তোর মাথা কতটা ঠাণ্ডা। নইলে ওটা যে একটা মোক্ষম ক্লু, আমি কি আর জানি না! দেখেই আমি বুঝেছি।

মিটমাট অতি সহজেই তারপর হয়ে যায়। মাথা ঠাণ্ডা সম্বন্ধে আমি সাবধান হবার কড়ার করি। ক্লু সম্বন্ধে আমার মতামতের মূল্য হারু স্বীকার করে।

কিন্তু তারপরই আমাদের গোয়েন্দাগিরির অগ্নিপরীক্ষা।

'রোঁদে' বেরিয়ে ক্লু সংগ্রহ করাটা একটু বুঝি একঘেঁয়ে হয়ে আসছিল, এমন সময় মস্ত এক কেস আমাদের হাতে এসে গেল। আমাদের মানে অবশ্য হারুর। কেসটা সেই কুড়িয়ে আনল বলা চলে।

আমাদের গলির পোড়ো বাড়িটাতেই আমাদের গোয়েন্দাগিরির গোপন পরামর্শ আজকাল হয় বিকেলের টহলদারীর পর।

আমার যে একটু গা ছমছম করে না, তা' নয়।

মৃদু প্রতিবাদও দু'একবার জানিয়েছি। গোয়েন্দারা ত' চোর-ডাকাত নয় যে, ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িতে আড্ডা গাড়তে হবে! হারুর পড়ার ঘরেই ত' আমাদের সভা করলে হয়। সেখানে কেউ বিরক্ত করবারও নেই। কিন্তু হারুর তাতে মত নেই।

আমাদের পেছনেও নাকি ভয়ঙ্কর সব শত্রুদের চর রাতদিন ঘুরছে। তাদের নজর এড়াবার জন্যেই এ রকম গুপ্ত ঘাঁটি দরকার। প্রকাণ্ড একটা জংলা বাগানের মধ্যে সেকেলে বিরাট একটি পোড়ো বাড়ি। বড়দের মুখে শুনি পাঁচভাগে পড়ে মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়ার দরুণই নাকি বাড়ি বাগানের এই দুর্দশা। কেউ ছোঁবেও না, ছাড়বেও না।

ঘর দালান সব প্রায় ভেঙে পড়েছে। একটি কুঠরি ওরই মধ্যে

ভালো। তারই ভাঙা দরজায় খিল দিয়ে আমাদের গোয়েন্দা-সভা বসে। আমাদের যত ক্লু সেই ঘরেই জমা করা হয়।

সেদিন হারু যে ক্লু নিয়ে এল আমিও দেখে অবাক। পোষ্টকার্ডে লেখা তিনটি চিঠি। শুধু চিঠি নয় হারুর হাতে একটা ভাঙা আতসী কাচও! তাই দিয়ে মোমবাতির আলোয় চিঠিগুলো সে দেখছে ত' দেখছেই। শেষে আর ধৈর্য রইল না।

—কাচ দিয়ে অত কি দেখছিস? শুধু চোখেই ত' সব পড়া যায়! তোর বাবাকে লেখা চিঠি। তাঁর কে মেসোমশাই লিখেছেন।

হারু বললে—তা' ত' লিখেছেন, কি লিখেছেন কিছু বুঝলি?

—বাঃ, তা' বুঝব না কেন! প্রথম চিঠিতে এখানে একটা বাড়ি কিনতে আসবেন লিখেছেন। পরের চিঠিতে যেদিন আসবার কথা সেদিন আসতে পারবেন না জানিয়েছেন। আর তার পরের চিঠিতে আবার কবে আসবেন সেই তারিখটা জানিয়েছেন। কালই ত' আসছেন দেখছি।

—হুঁ, আসছেন ত' বটে, কিন্তু কে?

—কেন? তোর বাবার মেসোমশাই, মানে তোর দাদু হন।

হারুর মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম, নিতান্ত বোকার মত চিঠির মর্ম কিছুই বুঝতে পারেনি। হারু এবার বুঝিয়ে দিলে পরিষ্কার করে।

চিঠিগুলোর ভেতর অমন সাংঘাতিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে কে জানত! আতসী কাচ আর হারুর বুদ্ধিতেই ধরা পড়েছে।

প্রথম দুটো চিঠি যাঁর লেখা তৃতীয়টা যে তাঁর নয়, হাতের লেখা দেখলেই নাকি তা' বোঝা যায়। সুতরাং ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র এর ভেতর আছে!

ষড়যন্ত্রটা কি হারুও ঠিক বোঝাতে পারল না। কিন্তু—

—কিন্তু ষড়যন্ত্র না থাকলে হাতের লেখা আলাদা হবে কেন? হাতের লেখা আলাদা কিনা আমি অবশ্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমি ত' আর হারুর মত হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট অর্থাৎ হাতের লেখা চেনার ওস্তাদ নই।

এতবড় ষড়যন্ত্রের ক্লু পেয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না। ঠিক হল, পরের দিন আমরা হাওড়া ষ্টেশনেই যথাসময়ে হাজির থাকব।

—কিন্তু সেখানে করব কি?

—সে আমি বলে দেব'খন।

—কিন্তু দাদুর বদলে যিনি আসছেন তাঁকে চিনবি কি করে?

হারু একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে—তাহলে আর হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্ট কিসের? হাতের লেখা দেখলে চেহারাও বলে দেওয়া যায়।

বাধা দিয়ে বললাম—আহা দাদুর চেহারা ত' তুই জানিস।

—জানি মানে! এ দাদুকে দেখিইনি কখনো। কিন্তু হাতের লেখা দেখেই চেহারা বুঝতে পারছি, যেমন শেষ চিঠির হাতের লেখা দেখে বুঝছি—লোকটা রোগা, একটু কুঁজো, বেশ ফিটফাট পোষাক, ফর্সা, চোখে চশমা, হাতে একটা ছড়ি।

থ' হয়ে গিয়ে বললাম—হাতে ছড়ি কি করে বুঝলি! ওটা ত' আর চেহারা নয়!

হারু গম্ভীর মুখে বললে—আমরা ওরকম বুঝতে পারি!

আমরা বলতে হয়ত আমাকেও বাদ দেয়নি এই আশায় চেপেই গেলাম পরের কথাটা।

পরের দিন ষ্টেশনে যথাসময়ে হাজির হয়ে কিন্তু রোগা, কুঁজো, ফর্সা, চোখে চশমা, হাতে ছড়ি একটা লোককেও ট্রেন থেকে নামতে দেখলাম না।

হারুর হুকুম তবু অক্ষরে অক্ষরে না মানলে নয়। রোগা ফর্সা না হোক, চোখে চশমা হাতে ছড়ি একজনকে দেখে, পাশে যেতে যেতে চাপা গলায় বললাম—সাবধান! আমরা সব জানি!

হারুর এইরকমই আদেশ ছিল।

যাত্রীদের ভীড়ে কুলীদের হট্টগোলে ভদ্রলোক কথাটা বোধহয় শুনতেই পেলেন না, কুলির পেছনে হন হন করে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু শিকার এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কোন রকমে ভীড় কাটিয়ে দৌড়ে তাঁর কাছে পৌঁছে বললাম আবার—সাবধান! আমরা সব জানি।

—কি বললে, খোকা! ভদ্রলোক ফিরে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাতেই মনে হল আর সেখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। ছুটে প্লাটফর্মের অন্য প্রান্তে হারুর খোঁজে গিয়ে দেখি তার অবস্থা আমার চেয়ে কাহিল!

একজন ভদ্রলোক তার হাত ধরে আছেন, আর অনেকে তার চারিধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। তারই মাঝে একটু উঁকি দিয়ে দেখি ভদ্রলোক হারুকে ধমকাচ্ছেন—পাজি হতভাগা ছেলে! ইয়ার্কি করবার আর জায়গা পাওনি! কি করতে প্ল্যাটফর্মে বেড়াচ্ছিলে? পকেট কাটতে না চুরি করতে!

ভিড়ের ভিতরে নানাজনের নানা মন্তব্য—দিন না মশাই পুলিশে ধরিয়ে! কার পকেট কেটেছে? কত টাকা ছিল? পেয়েছেন মাল?

—আরে থামুন মশাই, থামুন! ভদ্রলোক ভিড়ের লোকদেরও ধমকালেন—এ পকেট কাটার কেস নয়, তারচেয়ে ঘোরালো।

—কি হয়েছে কি? অনেকের আগ্রহ প্রশ্ন।

—আরে মশাই স্যুটকেসটা নিয়ে এগোচ্ছি, এমন সময় শুনি পাশে

পাশে কে বলছে—সাবধান ; আমরা সব জানি ! ফিরে চেয়ে দেখি এই মূর্তিমান !

সবাই হেসে উঠল। ভদ্রলোক আবার হারুকে নিয়ে পড়লেন—বল, কি করছিলে প্ল্যাটফর্মে ! ও কথার মানে কি ?

হারু একেবারে চুপ ! চেহারাটা সে ঠিকই চিনে বার করেছিল। হাতে ছড়ি না থাক, ভদ্রলোক রোগা লম্বা ফর্সাই বটে, চোখে চশমা পর্যন্ত আছে। কিন্তু ধরতে গিয়ে ধরা পড়েই যা ফ্যাসাদ বেধেছে।

চুপ করে থাকলেও ভদ্রলোক ছাড়বার পাত্র নন। আবার তিনি ধমকে উঠলেন—বল, কি তোমার নাম। মিথ্যে বললে পুলিশে দেব।

হারু ভয়ে ভয়ে এবার নাম বললে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নিই।

—বাবার নাম কি ? কোথায় থাকো ?

হারুর উত্তর শুনে ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন—কি বললে ? তুমি সলিল চাটুজ্যের ছেলে ? বেচু পরামাণিকের গলিতে থাকো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। হারু এবার কাঁদোকাঁদো। কিন্তু ভদ্রলোকের হাসি আর থামে না যেন

—হতভাগা আহাম্মক ছেলে ! তোমার এই সব বিদ্যে হয়েছে ! চল বাড়িতে গিয়ে তোমার এই সব কীর্তির কথা বলছি !

ভিড়ের সকলের সঙ্গে আমাকেও থ' করে দিয়ে ভদ্রলোক হারুর হাত ধরে হাসতে হাসতে ষ্টেশনের বাইরে চলে গেলেন।

পেছু পেছু গিয়ে দেখলাম হারু তাঁর সঙ্গেই ট্যাক্সিতে উঠছে।

লজ্জা পাবে বলে ক'দিন আর হারুর সঙ্গে দেখা করিনি। দিন তিনেক বাদ—সে-ই অমন বেহায়ার মত আমায় খুঁজতে আসবে কে জানত ! হাতে আবার একটা এয়ার গান।

—কি রে ? ক'দিন যাস্‌নি কেন ? আজ শিকারে যাব, চল !

হারুর নির্বিকার ভাব দেখে, না শিকারে যাবার কথায়, অবাক হলাম বলতে পারিনি। শুধু বললাম—শিকারে?

—হ্যাঁ, এয়ার গান দেখছিস না? দাদু কিনে দিয়েছে।

—দাদু! দাদু কে?

—আহা, যে দাদুকে সেদিন ষ্টেশনে ধরলাম হাঁদারাম কোথাকার! চেহারাটা কি রকম ঠিক আঁচ করেছিলাম দেখেছিস। তবে গোয়েন্দাগিরি আর করব না ভাবছি। এখন থেকে শিকার!

হারুর স্মৃতিশক্তির দৌড়, তার বরাতের জোর, আর তার গোয়েন্দাগিরি ছাড়ার সঙ্কল্প সব কিছুতে মিলে আমায় একেবারে ভ্যাবাচাকা লাগিয়ে দিলে।

আমি হতভম্ব হয়ে শুধু তার দিকে চেয়ে রইলাম!

নিরুদ্দেশ

পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার! পাঁচশো সাতশো নয় একেবারে পাঁচ হাজার! ব্রজবিনোদবাবুর চোখে আর ঘুম নেই। ঘুম যদি আসে তাহলে পাঁচ হাজার করকরে ঝকঝকে টাকা ছাড়া আর কিছুই স্বপ্ন নেই। কখনও সে পাঁচ হাজার টাকা ঝনঝন করে তাঁর সিন্দুকে পড়ে রূপোর ঝরণার মত, কখনও বা খসখসে খাস্তা নোট হয়ে রাশি রাশি তাঁর বিছানাময় ছড়িয়ে পড়ে চৈত্রী হাওয়ায় বনের ঝরা পাতার মত।

তা' স্বপ্ন দেখা আর আশ্চর্য কি? পাঁচ হাজার টাকা ত' বলতে গেলে ব্রজবাবুর হাতের মুঠোয়। হাতের মুঠোয় মানে এই পাশের ঘরের আরাম-কেদারায়; তাঁর সেই বড় সাধের আরাম-কেদারায়—যে কেদারায় কারুর এ পর্যন্ত বসা দূরের কথা ছোঁয়ার পর্যন্ত হুকুম ছিল না। সেই আরাম-কেদারায় পাঁচ হাজার টাকা জলজ্যান্ত হয়ে বসে আছে মনে করতেও ব্রজবাবুর সারা গায়ে কেমন একটা কাঁটা দিয়ে ওঠে—আনন্দে! ব্রজবাবু পাঁচ হাজার টাকা যেন অনুভব করতে পারেন, এ-ঘর থেকেই চোখে না দেখেই শুধু নাকে গন্ধ শুঁকেই। গন্ধ অবশ্য ঠিক পাঁচ হাজার টাকার বোধহয় না—তাঁর আর একটি বড় সখ—তাঁর দেরাজে রাখা দামী হ্যাভানা চুরুটের গন্ধের সঙ্গেই তার যেন কেমন একটা সাদৃশ্য আছে বলে সন্দেহ হয়। মূর্তিমান পাঁচ হাজার কি তাঁর দেরাজ খুলে তাঁরই দামী চুরুটের শ্রাদ্ধ করছে নাকি!

ব্রজবাবুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। অন্য সময় হলে বুঝি রক্তটাও মাথায় চড়ে যেত। কিন্তু এখন অমন ধৈর্য হারাবার সময় নয়। একটা বেফাঁস কিছু হয়ে গেলেই পাঁচ হাজার ফস্কে যেতে কতক্ষণ!

তবু চুরুটের ব্যাপারটার একটু তদন্ত না করলে মন মানে না। ব্রজবাবু ধীরে সুস্থে কিছুই যেন হয়নি এমনিভাবে পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকেন, মুখে একটি সাদর-আপ্যায়নের হাসি টানতেও ভোলেন না।

আরাম-কেদারার মূর্তিমান পাঁচ হাজার তাঁর দিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করে না। নিজের মনেই চুরুট টেনে যায়—সেই দামী হ্যাভানা চুরুট!

ব্রজবাবু আরও একটু কাছে এগিয়ে যান এবং ওই অবস্থায় কণ্ঠে যতখানি মধু রাখা সম্ভব ততখানিই ঢেলে বলেন—এই যে শিশির, তোমার কি বলে, চুরুট খাওয়াও অভ্যেস আছে নাকি?

শিশির, ওরফে ব্রজবাবুর মূর্তিমান পাঁচ হাজার, তাঁর দিকে এতক্ষণে একবার কৃপা-কটাক্ষ করে সংক্ষেপে জানায়—না।

চুরুটে টান কিন্তু তার সমানে চলতে থাকে।

না। ব্রজবাবুকে একসঙ্গে মুখের ও হৃদয়ের মাস্‌ল্ কণ্ট্রোল করতে হয়। হেসে বলেন—ও! অভ্যেস নেই! সখ করে একটু চেখে দেখছ বুঝি?

আবার সংক্ষিপ্ত জবাব—হ্যাঁ।

—কি জানো শিশির, ব্রজবাবু স্নেহের উপদেশ দেবার চেষ্টা করেন, অভ্যেস না থাকলে চুরুট খাওয়াটা আবার ভালো নয়। কি বলে—মাথা ঘুরতে পারে। তাছাড়া তোমাদের এই বয়েসে—

কথাটা শেষ করা হয় না! শিশির হাতের চুরুটটা—সবে মাত্র ধরান আস্ত চুরুটটা, নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাইরে জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বলে—না, এ চুরুটটা ভারী কড়া!

চুরুটটার সঙ্গে ব্রজবাবুর হৃৎপিণ্ডটাও যেন জানলা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ে। এই নিদারুণ যুদ্ধের বাজারে একটা দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য চুরুটে মাত্র ক'টা টান দিয়ে যে বাইরে ফেলে দেয়, কান ধরে তাকেও তৎক্ষণাৎ চুরুটের পেছনে পাঠাবার একটা প্রবল অভিলাষ হয়, কিন্তু

সে অভিলাষ কোন রকমে দমন করে তিনি বলেন, হেসেই বলেন—কেমন, বলেছিলাম কিনা !

—কি বলেছিলেন ? শিশিরের গলায় বেশ ঝাঁঝ ।

—ওই যে ! ব্রজবাবু অত্যন্ত অপরাধীর মত বলেন—অভ্যেস না থাকলে চুরুট খাওয়া ভালো নয় ।

—বেশ, কাল থেকে সিগারেট আনিয়ে দেবেন । একটু একটু করে অভ্যেস করতে হবে । শিশির আদেশ জারী করে ।

সিগারেট আনিয়ে দেব !—ব্রজবাবু খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকেন । একেবারে বিস্ময়ে নির্বাক ।

—না আনিয়ে দেন, দেবেন না । দরকার নেই আমার !—শিশির আরাম-কেদারা থেকে উঠে পড়ে বেশ রাগের সঙ্গেই ।

ব্রজবাবুর তৎক্ষণাৎ হৃৎকম্প হয় । পাঁচ হাজার টাকা বুঝি হাত-ছাড়া হয় এখুনি ! শশব্যস্ত হয়ে তিনি বলেন—আহা, রাগ করছ কেন ? আমি কি আনিয়ে দেবো না বলেছি ! তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

—একটু বায়োস্কোপে যাব ভাবছি । কাজ নেই কর্ম নেই, চুপ করে রাতদিন ঘরে বসে থাকতে ত' পারি না ।

তা' ত' নিশ্চয় !—একদিকে আশ্বস্ত হলেও আবার একটা বাড়তি খরচের সম্ভাবনায় মনে মনে বিচলিত হয়ে ব্রজবাবু বোঝাবার চেষ্টা করেন—কিন্তু বায়োস্কোপের বদলে ঘরে বসে বই পড়লেই ত' পার, ভালো ভালো বই । আমি না হয় লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে দিচ্ছি ।

বই পড়লে আমার মাথা ধরে ।—সোজা জবাব দেয় শিশির ।

আলনা থেকে শালটা—ব্রজবাবুরই দামী শালটা গলায় জড়িয়ে তারপর হাত বাড়িয়ে বলে—দিন পাঁচটা টাকা ।

—পাঁচ টাকা ! বায়োস্কোপে যেতে পাঁচ টাকা কেন ? দশ আনার টিকিটে গেলেই ত' হয় । ব্রজবাবু কাতরভাবে নিবেদন করেন ।

—না, হয় না। টিকিটের দাম দেড় টাকা ছাড়া চা খাওয়া আছে, আরো খুচরো খরচ আছে! পাঁচটা টাকায় হবে কিনা তাই ভাবছি।

শিশিরকে আঁর ভাববার অবসর দিতে ব্রজবাবুর সাহস হয় না। চটপট তিনি পাঁচটা টাকা বার করে দেন। শিশির অম্লান বদনে সেটি পকেটস্থ করে বলে—আমার চাকরীর ব্যবস্থা আপনি কিন্তু এখনও করলেন না। এরকম রোজ রোজ হাত পেতে আপনার কাছে টাকা নিতে কিন্তু পারব না বলে দিচ্ছি।

গোদের ওপর বিষফোঁড়াটুকুই ব্রজবাবুর পক্ষে অসহ্য। পাছে নিজেকে সামলাতে না পারেন এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি যাহোক একটা আশ্বাস দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে হিসেব করতে বসেন। পাঁচ হাজার টাকার এই দাঁওটা গেঁথে ডাঙায় তুলতে এ পর্যন্ত চারে, সুতোয়, ছিপে, বঁড়শিতে তাঁর কি পর্যন্ত গেছে তারই হিসেব।

ব্রজবাবুর পরিচয় নিশ্চয় দিতে হবে না। তাঁর নাম এ পাড়ায় কে না জানে এবং কেই বা মুখে আনে—অন্ততঃ একবেলার খাওয়া-দাওয়া না সেরে নয়। মাত্র তিন বছর তিনি মোটা পেন্সন নিয়ে এ পাড়ায় এসে ডেরা বেঁধেছেন, কিন্তু এই তিন বছরেই পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই তাঁকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে। তিনকূলে কেউ নেই, অবস্থাও বেশ ভালো, কিন্তু এমন হাড়-কঞ্জুস দুনিয়ায় আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। এই সেদিন পাড়ার ছেলেরা সাত দিন তাঁর দোরে হাঁটাহাঁটি করে সরস্বতী পুজোর জন্যে নগদ একটা সিকি চাঁদা আদায় করেছিল—অবশ্য দেখা গেছল সিকিটা অচল।

তা' বলে ব্রজবাবু খরচ করেন না, এমন নয়, কিন্তু সে শুধু দুটি ব্যাপারে ; এক তাঁর নিজের সুখ আর সখের জন্যে আর ফাঁকিতে যদি কোথাও মোটা কিছু দাঁও মারা যায় তারই ফিকিরে।

কিন্তু এই দুটি ব্যাপার ছাড়া, পরস্মৈপদী হবার সুযোগ পেলে বাজে খরচের ধার দিয়ে তিনি যান না। পাড়ার ভুবনবাবুর বাড়িতে সকালে চা-টা ভালো হয়। টোস্টও থাকে বুঝি সঙ্গে। ব্রজবাবুর তাই সকালে একবার ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা না করলে দিনটাই খারাপ যায়। বিকালে ভবতোষবাবুর বাড়ির তিনি নিত্য অতিথি! সেখানে একটু রাজনীতি আলোচনা না করলে তাঁর নাকি ঘুমই হয় না। বলা বাহুল্য, জল-খাবারটা সেখানেই সারবেন। সূর্যবাবুর বাড়ির পেছনে ছোট্ট একটা বাগান আছে। প্রায়ই সেখানে ব্রজবাবু পায়ের ধূলো দেন কচি ঢেঁড়শ বা পাকা পেঁপেটা কলাটা মূলোটা বেগুনটা শশাটার তারিফ করতে। ঠিকমত তারিফ করতে কিছু তাঁকে নিয়েও আসতে হয় সঙ্গে—নিদেন পক্ষে দুটো কাঁচালঙ্কা না নিয়ে তিনি ফেরেন না।

কিন্তু ব্রজবাবুর এমনই দুর্ভাগ্য যে, পাড়ার লোকের পাল্টা খাতির করবার সুযোগ তাঁর এপর্যন্ত হল না। বাড়িতে কেউ কদাচিৎ যদি আসে, তাহলে ঠিক সেই দিনই তাঁর চাকরটা কোথায় যে পালিয়ে থাকে তার ঠিকানা মেলে না; চাকরটা থাকলেও উনুন আর ধরতে চায় না; আর যদি বা উনুন ধরে, হঠাৎ সেই দিন চায়ের টিন, চিনির বোয়েম এমন খালি থাকে যে চাকরকে ধমক দিয়ে বাজারে পাঠাতে হয় তৎক্ষণাৎ। ব্রজবাবুর চাকর সে বেলা যে আর বাজার থেকে ফেরে না, তা' বোধ হয় বলাই বাহুল্য।

এই আমাদের ব্রজবাবুর জীবনে হঠাৎ পাঁচ হাজার টাকার দাঁও কেমন করে দেখা দিল, এবার বলি। সকালে ভুবনবাবুর বাড়ি চায়ের পাট সেরে ব্রজবাবু সেদিন পাড়ার লাইব্রেরীর ফ্রি রীডিং-রুমে বসে খবরের কাগজগুলোর সার সংগ্রহ করছেন। খবরের ওপর তাঁর অবশ্য কোন টান নেই। তিনি পড়েন শুধু বিজ্ঞাপন।

সেদিন বিজ্ঞাপনের পাতাগুলো পড়ে ব্রজবাবু একরকম হতাশই

হয়েছেন। একটি ছাড়া আর কোন বিজ্ঞাপন তাঁর মনে দাগ দেয়নি। বিজ্ঞাপনটি টাকে চুল ওঠবার কোনো এক অত্যাশ্চর্য তেলের। ব্রজ-বাবুর মাথায় টাক আছে সত্যি কিন্তু সে টাক সারাবার ব্যাকুলতায় ও বিজ্ঞাপনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হননি। তাঁর আকর্ষণের কারণ আলাদা। টাকের তেলের আবিষ্কারক সগর্বে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর এই তেলের দাবী মিথ্যে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারলে তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতে প্রস্তুত। নিজের মাথার টাকে ওই তেলকে বিফল প্রমাণ করে আইনের ফেরে হাজার টাকা হাত করা যায় কিনা, প্যাঁচ কষতে কষতে পাশের আরেকটি বিজ্ঞাপনে ব্রজবাবুর চোখ পড়ে। সাধারণ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন, কিন্তু পুরস্কারের বহর একেবারে পাঁচ হাজার! জোয়ান বয়সের একটি ছেলের ছবির নীচে সেই মামুলি ভাষায় বিজ্ঞপ্তি—এই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটির সন্ধান বক্স-নম্বর ....তে পৌঁছে দিলে পাঁচ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার!

লুব্ধ দৃষ্টিতে ছবিটির দিকে ব্রজবাবু তাকিয়ে আছেন, এমন সময় —হ্যাঁ ঠিক সেই আশ্চর্য মুহূর্তেই ঘরে যে ছেলেটি এসে ঢোকে, তার দিকে ফিরে ব্রজবাবু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান! নিজের চোখকেই তাঁর বিশ্বাস হয় না। এও কি সম্ভব! দুরু-দুরু বুকে তিনি আর একবার চোখ বুলিয়ে নেন, তারপর ছেলেটিকে তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করেন। হ্যাঁ, কোন ভুলই নেই, এমন কি ডান দিকের কপালের কাটা দাগটি পর্যন্ত।

ছেলেটি তখন তাঁর কাছেই চেয়ারে বসে খবরের কাগজ টেনে পড়তে সুরু করেছে। এমন সুযোগ জীবনে আর দু'বার আসে না।

ব্রজবাবু আর দ্বিধা না করে পাশে সরে যান। একটু ইতস্ততঃ করে ব্রজবাবু যথাসম্ভব মধুর কণ্ঠে আলাপ সুরু করেন—আপনাকে ত' আগে এখানে দেখিনি।

ছেলেটি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির বলে মনে হয়। ব্রজবাবুর দিকে না তাকিয়ে সে বললে—আমিও আপনাকে দেখিনি।

ব্রজবাবু দমবার পাত্র নন, বলেন—তা, তা' বটে। তা' এখানে বুঝি কাগজ পড়তে এসেছেন ?

জবাব আসে—না, চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখতে।

—চাকরী! আপনি চাকরী খুঁজছেন নাকি ?

এবার ছেলেটি ব্রজবাবুর দিকে ভ্রূকুটি করে তাকায়—হ্যাঁ, খুঁজছি, দেবেন নাকি একটা ?

ব্রজবাবু একটু বুঝি হকচকিয়ে যান। তক্ষুনি কিন্তু সামলে নিয়ে বললেন—তা' চাকরী একটা চেষ্টা করলে কি আর দেওয়া যায় না ?

কথাটা খুব নীচু গলাতেই ব্রজবাবু বলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেমন করে টেবিলের ওধারে ক'জনের সেটা কানে গেছে, বোঝা যায়। একজন বলে ওঠে—ব্রজবাবু আজকাল চাকরী বিলোচ্ছেন নাকি ?

পাড়ার চাঁদা-চাওয়া এই ফাজিল ছেলেগুলোকে ব্রজবাবু তু'চক্ষে দেখতে পারেন না, কিন্তু এখন বাজে ঝগড়ায় সময় নষ্ট করা চলে না।

—না, না, এই বলছিলাম! বলে একটু হেসে সে প্রসঙ্গে দাঁড়ি টেনে ব্রজবাবু আবার তাঁর নতুন শিকারের প্রতি মনোযোগ দেন—তা' আপনি থাকেন কোথায় ?

—কোথাও না, যখন যেখানে সুবিধে হয়।

ব্রজবাবুর নাড়িটা ডবল কদমে চলতে সুরু করে। সহানুভূতিতে একেবারে গলে গিয়ে তিনি বলেন—জানা-শোনা কেউ নেই বুঝি এখানে ? ভারী তুঃখের কথা ত'!

চাঁদা-চাওয়া ফাজিল ছেলেদের একজন বলে ওঠে—অত যদি তুঃখ, তাহলে ভদ্রলোককে আপনার বাড়িতেই জায়গা দিননা তু'দিন।

ফাজিল ছেলেটাকে এবার ব্রজবাবুর আশীর্বাদ করতে ইচ্ছে হয়।

কথাটা একেবারে লুফে নিয়ে তিনি বলেন—তা' কি আর দিতে পারি না ! বিপদের দিনে লোককে যদি জায়গা দিতে না পারলাম ত' বাড়িঘর আছে কি জন্যে ?

খানিকক্ষণ সমস্ত ঘর একেবারে স্তব্ধ, স্তম্ভিত। দেয়ালের টিকটিকিটার নাকের কাছ দিয়ে একটা সুপুষ্ট মাছি অকুতোভয়ে হেঁটে চলে যায়।

সে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা নিজেই একটু সলজ্জ হাস্যে বিচূর্ণ করে ব্রজবাবু বলেন—কিন্তু উনি কি আর তা' থাকবেন !

—সুবিধে হলেই থাকতে পারি। ছেলেটি তাচ্ছিল্যভরে জানায়, কিন্তু ব্রজবাবু হাতে স্বর্গ পান।

সেই সকাল থেকেই পাঁচ হাজার টাকার সেই রত্ন অর্থাৎ শিশির, ব্রজবাবুর বাড়িতে অধিষ্ঠিত। ব্রজবাবু শিশিরকে বাড়িতে তুলেই খবরের কাগজের বক্স নম্বরের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক মুহূর্ত বিলম্ব করেননি। পাঁচ হাজার টাকা সিন্দুকে তুলতে আর কতক্ষণই বা বাকি। কিন্তু সেই ততক্ষণই শিশিরকে ধরে রাখা এমন সমস্যা হবে, কে জানত !

সকালবেলা খেতে বসেই শিশির গোলমাল সুরু করেছে—ছোঃ, এরকম চাল খাওয়া যায় নাকি ! আর ঘি কোথায় ?

ব্রজবাবু সঙ্কুচিতভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে বাজারে সব ভেজাল, সেই ভয়েই তিনি ঘি খাওয়া ছেড়েছেন।

—বেশ ত' ! মাখন গালিয়ে নিলেই পারেন, ঘি নইলে আমার খাওয়া হয় না। অম্লান বদনে বলেছে শিশির তারপর এক এক করে সব রান্নারই খুঁত ধরে জানিয়ে দিয়েছে যে, মাছ-মাংস তরি-তরকারী দু'বেলা তার ভালোমত চাই, নইলে সে এখানে থাকতে

পারবে না। হ্যাঁ, রাত্রে লুচির সঙ্গে রাবড়ীর বদলে ভালো কাঁচাগোল্লা হলে তেমন কিছু আপত্তি তার নেই।

পাঁচ হাজারের খাতিরে ব্রজবাবুকে তারপর সব বন্দোবস্তই করতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও রেহাই আছে কি? এক এক করে শিশিরের বায়না মেটাতে মেটাতে নিজের শোবার ঘর আসবাবপত্র বিছানা ছেড়ে ব্রজবাবু পাশের এই ছোট্ট কুঠরীতে এসে উঠেছেন। যা কিছু তাঁর ব্যবহারযোগ্য কাপড়-চাদর, সে সবে তাঁর নিজের অধিকার আর নেই। শিশিরই ইচ্ছামত তার সদ্ব্যবহার করে। নেহাৎ জামাটা জুতোটা মাপে মেলে না বলেই বোধ হয় ছোঁয় না। এর ওপর রোজ তার বাজে হাত-খরচ আছে—ব্রজবাবু একটু আপত্তি জানিয়েছেন কি তৎক্ষণাৎ সে বাড়ি ছেড়ে যেতে প্রস্তুত। কাজেই ব্রজবাবু নিঃশব্দেই সব হজম করে যান, এমন কি শিশিরের মন রাখতে তাঁর পুরোন অফিসে গিয়ে একদিন তিনি শিশিরের চাকরির জন্যে সুপারিশ পর্যন্ত করে এসেছেন! মনে মনে গুমরে ব্রজবাবু শুধু দিন গোনেন। দিন গোনেন চিঠির উত্তরটা আসার অপেক্ষায়। একবার পুরস্কারটা হাতের মুঠোয় এলে হয়। কিন্তু উত্তরটা আসতে যেন বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে! নিরুদ্দিষ্ট ছেলের জন্যে অমন ব্যাকুল বিজ্ঞাপন যারা দেয়—তাদের জবাবটা আরো একটু চটপট আসা উচিত ছিল না কি?

ব্রজবাবুর হিসেব ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। দেখা যায় খাই-খরচা, এমন কি চুরুটের দামটাও ধরে শিশিরের জন্যে এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে একশ তিয়াত্তর টাকা সওয়া তের আনা। সুতরাং এখনো চার হাজার আটশ ছাব্বিশ টাকা পৌনে তিন আনা ব্রজবাবু লাভ বলে ধরতে পারেন। কিন্তু শিশিরকে আর কিছুদিন এমন করে রাজার হালে রাখতে হলে সে লাভ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে ব্রজবাবু একটু বিচলিত হয়ে পড়েন।

না, আরেকটা চিঠি বক্স-নম্বরের ঠিকানায় না পাঠালেই নয়। এমনও ত' হতে পারে যে তাঁর আগের চিঠি ঠিক জায়গায় পৌঁছায়নি।

ব্রজবাবু সন্তর্পণে তাঁর নিজের—আপাততঃ অবশ্য শিশিরের ঘরের দিকে পা বাড়ান। শিশির আবার আজকাল এঘরে তাঁর যখন-তখন আসা পছন্দ করে না, তাই এই সাবধানতা। ব্রজবাবু সবে টেবিলে গিয়ে বসেছেন, এমন সময় বাইরে শিশিরেরই সাড়া পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি সরে পড়বার আগেই শিশির শিষ দিতে দিতে ঘরে ঢুকে উৎফুল্লভাবে বলে—ধন্যবাদ ব্রজবাবু, ধন্যবাদ।

ব্রজবাবু বেশ একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েন! শিশিরের এ চেহারা তাঁর কাছে একেবারে নতুন। অবাক হয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—তুমি—মানে, ফিরে এলে যে এত তাড়াতাড়ি?

একটা চিঠি ব্রজবাবুর নাকের সামনে দু'বার নেড়ে শিশির বলে—না, এতবড় সুখবরটা পেয়ে আর বায়োস্কোপে যেতে ইচ্ছে হল না!

সুখবর! চিঠিটার দিকে চেয়ে ব্রজবাবুর বুকটা আশায় দুলে ওঠে। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা ছিনিয়ে নেবার প্রবল বাসনাটা দমন করে তিনি বলেন—সুখবর! সুখবরটা কিসের?

—এই যে দেখুন না। ব্রজবাবুর সামনে চিঠিটা ফেলে দিয়ে শিশির বলে—এইমাত্র পিওন দিয়ে গেল। যাক, চাকরীটা পাওয়ার জন্যে আপনাকেই আগে কৃতজ্ঞতা জানান উচিত।

—চাকরী! ও তুমি চাকরী পেয়েছ বুঝি?—হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করেন ব্রজবাবু, চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে।

—হ্যাঁ, আপনারই সুপারিশে। আপনারই অফিসের সেই চাকরীটা। চলে যাবার আগে আপনাকে তাই ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছি।

—যাবার আগে! ব্রজবাবু যেন চাবুক খেয়ে উঠে দাঁড়ান—তুমি চলে যাচ্ছ নাকি?

—তা' যেতে হবে বইকি! ভাবছি চাকরী যখন পেয়েই গেলাম তখন মামার বাড়িতেই উঠি। আর মামার বাড়ি যখন এত কাছে!

—এত কাছে তোমার মামার বাড়ি! ব্রজবাবু রাগে, দুঃখে বিস্ময়ে প্রায় ফেটে পড়েন।—কই সে কথা ত' আমায় আগে বলনি!

—আপনি জিজ্ঞেস করলে ত' বলব! অবশ্য আমার মামাকে আপনি ভালো করেই চেনেন। অন্ততঃ তাঁর বাগানের তরি-তরকারী ত' বটেই। আমি সূর্যবাবুর ভাগনে।

—তুমি সূর্যবাবুর ভাগনে! তাহলে—কাগজের ওই নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের মানে?

—মানে আর কি এমন শক্ত! ও বিজ্ঞাপন আমি নিজেই দিয়েছিলাম।

—তুমি নিজেই দিয়েছিলে! —তাহলে ওই পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার!—এতক্ষণে ব্রজবাবুর কণ্ঠ থেকে যেন একটা অস্ফুট আর্তনাদ বার হয়।

—হ্যাঁ, পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার একটা সমস্যা বটে!—শিশির বেশ একটু চিন্তিতভাবেই বলে। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে ঠিক করেছি, টাকাটা আমি নিজেকেই দিয়ে দেব। কারণ, সত্যি কথা বলতে গেলে আমি নিজেই নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। হঠাৎ এই চাকরীটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার করে ফেলেছি নিজেকে। সুতরাং পুরস্কারটা ন্যায়ত আমারই প্রাপ্য। অবশ্য চাকরীর জন্যে ধন্যবাদটা সম্পূর্ণ আপনার পাওনা।

এই চরম আঘাত ব্রজবাবুকে বসিয়ে দেয় একেবারে, শিশিরের এগিয়ে দেওয়া তাঁরই নিজের আরাম-কেদারায়।

পুতুলের লড়াই

ঘর সংসার গোছগাছ করে ইতনু, পুতনু আর মিকাইকে বিছানায় শুইয়ে, তুতুলের পেটটা সেফটিপিন দিয়ে আটকে সবে খুকুর একটু ঘুম এসেছে—এমন সময় সদর দরজায়, ঝন ঝন ঝনাৎ !

ছ'চোখ রগড়ে খুকু উঠে বসল। ওমা ! এত রাত হয়ে গেছে, সে টের পায়নি ত' ! বাড়িতেও ত' কেউ কোথাও নেই। মা বাবার বিবেচনাটাও কেমন ! বলে গেল, এই এখুনি আসছি মাসির বাড়ি থেকে, তাইনা খুকু রাজি হয়েছিল পুতুল খেলা নিয়ে ঘরে থাকতে। এই এখুনি বলে গিয়ে এই এত রাত পর্যন্ত কিনা বাড়ি আসবার নাম নেই। এখন খুকু করে কি !

সদর দরজায় আবার ঝন ঝন ঝনাৎ। ভিখু—ভিখুই বা গেল কোথায় ! দরজাটা খুলে দিয়ে সে ত' একটু খোঁজ করে আসতে পারে। যা কুঁড়ের ধাড়ি চাকর ! বাড়িতে কেউ নেই দেখে হয়ত নিজে ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কি আর করে ! অগত্যা খুকুকে নিজেই গিয়ে দরজাটার কাছে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয়—কে তুমি, কি চাও ?

দরজার বাইরে থেকে ভারী গলায় আওয়াজ আসে—দরজা খোলো, টেলিগ্রাম আছে।

টেলিগ্রাম ! এত রাত্রে টেলিগ্রাম এল আবার কার ! খুকু এবার দরজাটা একটু ফাঁক করে খুলে উঁকি মেরে দেখে, বাইরের অন্ধকারে একটা লম্বা আবছায়া চেহারা দাঁড়িয়ে আছে। খুকুকে দেখে সে হাত বাড়িয়ে একটা খাম আর কাগজ দিয়ে বললে—সই করো।

—সই ত' করব, কিন্তু টেলিগ্রামটা কার ?

—টেলিগ্রাম ইতনুর !

ওমা ! ইতনুর নামে টেলিগ্রাম আবার কি ! আট বছর বয়স হল, এমন কাণ্ড ত' সে জন্মে দেখেনি। তবু সই করে টেলিগ্রামটা খুকুকে নিতেই হল। ঘরে ফিরে এসে টেলিগ্রামটা খুলতে গিয়ে সে অবাক। ইতনু, পুতনু, মিকাই, তুতুল সবাই উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিছানা ছেড়ে।

দেখি কি টেলিগ্রাম !—বলে ইতনুই খামটা খুকুর হাত থেকে টেনে নিলে। তারপর টেলিগ্রামটা পড়ে তার সে কি মুখের চেহারা। ইতনু, মিকাই আর তুতুল ত' কেঁদেই আকুল। নেহাত কাঠের তৈরি বলেই ইতনুর চোখে জল নেই—সে একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

—আরে কি হয়েছে, কি ব্যাপারটা ? খুকু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

পুতনু আর মিকাই কেঁদে ফেলে বললে—ইতনুকে যুদ্ধে যেতে হবে।

—যুদ্ধে যেতে হবে ! সে আবার কি ?

—হ্যাঁ, আমাদের সম্রাটের আদেশ। সম্রাটের উদ্দেশে ইতনু সেলাম জানালে।

—সম্রাটের আদেশ ত' বুঝলাম, কিন্তু যুদ্ধ কার সঙ্গে ?

ইতনু এবার একটু যেন বিব্রত হয়ে বললে—যুদ্ধ কাঠের সঙ্গে কাঁচকড়ার।

পুতনু মুখখানি কাঁচুমাচু করে বললে—আমি ত' কাঁচকড়া, আমাদের সঙ্গে তোমাদের কিসের ঝগড়া ?

—ঝগড়া চিনেমাটির খবরদারি নিয়ে। কাঠ আর কাঁচকড়া দুজনেই চিনেমাটিকে উদ্ধার করতে চায়, অথচ কেউ কাউকে আমল দিতে নারাজ।

মিকাই ছল ছল চোখে বললে—চিনেমাটি ত' আমি! আমায় উদ্ধার করবার জন্যে তোমরা ঝগড়া করে মরবে কেন? আমার দায় আমি কি নিজে সামলাতে পারি না?

ইতনু বললে—তা' জানিনা, তবে সম্রাটের যা আজ্ঞা তা' ত' না মেনে আমার উপায় নেই। আমায় যুদ্ধে যেতেই হবে।

খুকু এতক্ষণ হাঁ করে এদের কথাবার্তা শুনছিল, এবার কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—কিন্তু লড়াই মানে কি তা' জানো? আর কি তোমায় আস্ত ফিরে পাব!

ইতনু কাঠের মতই শক্ত হয়ে বললে—ফিরে যদি না আসি তা' হলে জানবে, সম্রাটের জন্যে জীবন দিয়ে আমি স্বর্গে গেছি।

ইতনুকে আর কিছুতেই যখন ধরে রাখা যাবে না, তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে যাবার ব্যবস্থা তাকে করে দিতেই হল। এই সেদিন ইতনুর একটা পা খাট থেকে পড়ে আলগা হয়ে গেছে। লোহার তার দিয়ে সেটা খুকু ভালো করে এঁটে দিলে। রোদ লাগলে ইতনুর বড় গা চটে যায়, তাই সঙ্গে দিলে একটু হরতেল।

বিদায় নেবার সময় সকলের চোখে জল। নেহাৎ কাঠ বলে তার কাঁদতে নেই, তবু ইতনুর চোখটা যেন চকচক করে উঠল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আর সে তাই দাঁড়াল না। কাঠের পা খটখটিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইতনু, মিকাই আর তুতুলকে নিয়ে খুকু খানিক চুপ করে বসে রইল। কারুর মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ পুতনু আর মিকাই দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমরাও এবার চলি তাহলে।

—তোমরা কোথায় যাবে? অবাক হয়ে বললে খুকু।

—যাব যে যার দলে। কাঁচকড়া হয়ে যখন জন্মেছি তখন জাতের মান ত' রাখতেই হবে। পুতনু সামনে পা বাড়াল।

মিকাই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে বললে—আমায় নিয়েই যখন এত কাণ্ড, তখন আমিই বা যুদ্ধে না গিয়ে করি কি !

তুতুল বেচারা নেহাৎ ভালো মানুষ, এতক্ষণ সে কোন কথাই বলেনি। এবার কিন্তু সেও উঠে দাঁড়াল—তাহলে আমি কোথায় যাব !

পুতনু আর মিকাই দুজনে করুণভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি আর কোথায় যাবে, তোমার ত' নিজের বলতে কিছু নেই। শুধু খানিকটা সেলাই করা তূলো। তুমিত' জাত-পুতুল নও।

তুতুল ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। পুতনু আর মিকাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারা যেতে না যেতেই হঠাৎ সমস্ত আকাশ যেন যন্ত্রণায় ডাক ছেড়ে ককিয়ে উঠল।

সাইরেন ! সাইরেন ! উড়ো জাহাজ আসছে বোমা ফেলতে। তাড়াতাড়ি মোমবাতিটা নেভাতে গিয়ে তুতুলের পেটের তূলোয় আগুন প্রায় ধরে গিয়েছিলো আর কি ! খুকু কোন রকমে সেটা সামলে তুতুলকে বুকে নিয়ে চুপ করে টেবিলের তলায় গিয়ে বসল।

দুড়ুম ! দড়াম দুম····বোমা পড়ছে চারিধারে। দমাস করে একটা বোমা পড়ে খুকুর খেলার ঘরটাতেই আগুন ধরে গেছে। এবার তুতুলই কোল থেকে নেমে খুকুকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল, —শিগগির ! শিগগির এস বেরিয়ে !

কিন্তু বেরিয়ে এসে যাবে কোথায়। রাস্তাঘাট সব অন্ধকার। তারি মধ্যে আকাশে গোঁ গোঁ করতে করতে উড়ো জাহাজগুলো বিশাল সব ক্ষ্যাপা ভোমরার মত লাফ দিচ্ছে,আওয়াজে রাস্তা কাঁপিয়ে দৈত্যাকার কচ্ছপের মত ট্যাঙ্কগুলো গড়িয়ে চলেছে, মুহূর্তে মুহূর্তে গোলাগুলিতে আকাশ যেন ফেটে গিয়ে বজ্র ঠিকরে বেরুচ্ছে।

কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গা বুঝি নেই। যেদিকে চাও শুধু যুদ্ধের সেপাই। দলে দলে তারা গান গাইতে গাইতে চলেছে।

কাঠেরা গাইছে ঃ

আমরা কাঠ, আমরা কাঠ !
লোহার মত শক্ত গাঁঠ ।
ফাটতে পারি কাটাও পড়ি
নোয়াই নাকো ঘাড়
চাঁদের হাটের দেশের মোরা
অমর গাছের ঝাড় !

কাঁচকড়ারা গাইছে ঃ

আমরা সেরা কাঁচকড়া,
সব চাইতে দর চড়া !
তুনিয়ায় আর আছে যারা
দাম ত' তাদের পাঁচ কড়া ।
ঘরের খেয়ে তাড়িয়ে বেড়াই
বনের যত মোষ ;
তুধটা তুয়ে নিই বটে সব,
হয় কি তাতে দোষ ?

একে এই গোলমালে দিশেহারা, তার ওপর তুতুলের কথায় খুকু হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পায় না। তুতুল তখন তাকে টানতে টানতে বলছে—তুমি কিছু ভেবো না খুকু-মা, আমি কাছে থাকতে তোমার কিছু ভয় নেই।

ছুটোছুটিতে এদিকে তুতুলের পেটের সেফটিপিন খুলে খানিকটা তূলো বেরিয়ে পড়েছে। খুকু তাড়াতাড়ি তূলোটা ভরে সেফটিপিনটা এঁটে দিতে যাবে এমন সময় কাছ থেকে কে হেঁকে উঠল—খবরদার।

এখানে ঘুপটি মেরে এক কাঁচকড়া-সিপাই বসেছিল আগে ত' চোখে পড়েনি ! খুকু আর তুতুল তুজনেই ভয়ে থমকে দাঁড়াল।

সিপাই ধমক দিলে—জানতা নেই, হিঁয়া ঠারনেকা হুকুম নেহি !

—আরে, এ যে পুতনু !

খুকু আর তুতুল ছুজনেই বলে উঠল—আরে তুমি এখানে !

পুতনুও এবার তাদের চিনতে পেরে বললে—হ্যাঁ, আমি এখানে পাহারায় আছি কি না ! কিন্তু তোমাদের এখানে থাকা ত' চলবে না। এ হল মিলিটারি এলাকা !

থাকা যদি না চলে ত' আর উপায় কি। খুকু তুতুলকে নিয়ে চলে যাবে এমন সময় পুতনু তুতুলের পেট থেকে খানিকটা তূলো খাবলে নিয়ে বললে—কিছু মনে করোনা ভাই, একটু তূলো ধার নিলাম, কাটা-ছেঁড়ার জন্যে দরকার হয় কি না !

অতখানি তূলো হারিয়ে তুতুল বেশ তখন কাবু হয়ে গেছে, তবু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—এটা কি রকম ব্যবহার ! আমার তূলো তুমি কেড়ে নিলে যে বড় !

পুতনুর একমুহূর্তে একেবারে অন্য রকম চেহারা। চোখ রাঙিয়ে বললে—নিয়েছি বেশ করেছি। জানো কত বড় আদর্শের জন্যে আমরা যুদ্ধ করছি। চাল নেই, চুলো নেই, তার আবার একটু তূলো দিয়ে তেজ দেখ না।

খুকু তাড়াতাড়ি তুতুলকে নিয়ে ছুট না দিলে পুতনু তুতুলকে আরো খানিকটা হাল্কা করে দিত বোধ হয়।

হতাশ হয়ে এদিক ওদিক খানিক ছুটোছুটি করে হয়রান হবার পর তুতুল বললে—চল খুকু-মা, ইতনুর কাছে গিয়ে ধরা দিই। শুনেছি কাঠেরা ওপরে শক্ত কিন্তু ভেতরটা তাদের ভিজে।

তুতুলের মুখের কথা খসতে না খসতে এক দল কাঠ-সিপাই এসে তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। ভারী জমকালো পোশাকের একজন সেনাপতি এগিয়ে এসে কড়াগলায় তাদের জিজ্ঞাসা করলে—তোমরা কাঠ না কাঁচকড়া !

খুকু বললে—সে কি ! আমাদের চিনতে পারছ না, ইতনু !

ইতনু একটু যেন লজ্জিত হয়ে বললে—তাই ত' ! ভারী ভুল হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু তোমরা এই লড়াই-এর মাঝখানে কেন ? যাও যাও, এখান থেকে শিগগির সরে পড়ো। হ্যাঁ, যাবার আগে একটু তুলো দিয়ে যাও দেখি।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই তুতুলের পেটটা সে প্রায় ফাঁক করে দিলে। তুতুল তখন এমন চুপসে গেছে যে একটা কথা বলবারও তার ক্ষমতা নেই।

খুকু আর কি সেখানে দাঁড়ায়। তুতুলকে নিয়ে তখুনি সে ছুট দিলে। কিন্তু কোন দিকে সে যাবে কিছুই যে জানা নেই। হন্তদন্ত হয়ে একজনকে ছুটে আসতে দেখে সে মিনতি করে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গেলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি বলতে পার ?

আরে, এ যে খুকু-মা আর তুতুল দেখছি ! তুতুল যেন বড় কাহিল হয়ে গেছ !

মিকাইকে দেখে খুকু এবার সত্যি খুশী। কাঠও নয় কাঁচকড়াও নয়, সে হল চিনেমাটি। খুকু তাই আবার বললে—দেখছ ত' তুতুলের কি হাল হয়েছে ! বল না মিকাই, ওকে কোথায় নিয়ে যাই।

—সেই ত' হয়েছে মুশকিল ! বললে মিকাই—আমি নিজেই কোথায় আছি জানি না। আমার আদ্ধেক নিয়েছে কাঠ আর বাকি আদ্ধেকে সদ্দারি করছে কাঁচকড়া। তা' যেখানেই যাও একটু তুলো দিয়ে যাও দেখি তুতুল।

তুতুলের হয়ে খুকু বাধা দেবার আগেই মিকাই ছোঁ মেরে যথা সম্ভব হাতিয়ে নিয়ে বললে—দুঃখী চিনেমাটির জন্যে তোমার এ দান জীবনে ভুলব না তুতুল ! আচ্ছা চলি তাহলে।

তুতুল তখন ন্যাতা হয়ে একেবার নেতিয়ে পড়েছে। খুকু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। চোখে তার জল পর্যন্ত যেন আর নেই।

অনেকক্ষণ বাদে তুতুলের ক্ষীণ গলার স্বরে তার যেন সাড়া ফিরে এল। তুতুল ধীরে ধীরে বলছে—আমার জন্যে আর তুমি ভেবো না, খুকু-মা।

—না আর ভাববার কিছু নেই, কিন্তু কি করব এখন!

—কিছু আর করতে হবে না। এইখানে, কামানের গোলা-ফাটা এই গর্তে আমায় শুধু একটু শুইয়ে দাও। আমি জানি সব আমার গেলেও কোথায় একটা বীজ এখনো আছে, যা যাবার নয়। এই যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন সেই বীজ থেকে হয়ত একটা চারা একদিন উঠবে। হয়ত সে চারা থেকে গাছ হয়ে একদিন তাতে আবার শাদা মেঘের মত তূলো ধরবে। তুমি তখন বড় হবে খুকু-মা, হয়ত চরকা কাটবে। তূলো হয়ে আমি যেন সেদিন তোমার চারকায় গিয়ে জড়াই। আমায় দিয়ে তুমি এমন সূতো কেটো যা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসা আর শ্রদ্ধার রাখী-বন্ধনে বাঁধা যায়। পৃথিবীতে আর যেন কেউ এমন যুদ্ধ না করে।

তুতুলের কথা শেষ হতে না হতেই শোনা গেল, দুম্ দুম্ দড়াম্। ওকি গোলা পড়ছে না কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে!

তাইত, দরজায় ধাক্কাই ত'। খুকু তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেয়। মা-বাবা ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বলেন—ওমা খুকুমণি, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। এই ত' আধঘণ্টাও হয়নি গেছি, এরি মধ্যে দরজা দিয়ে ঘুম!

মোটে আধঘণ্টা! খুকু অবাক হয়ে খেলাঘরের দিকে তাকায়। চোখে দেখেও তার বিশ্বাস হতে চায় না যে ইতনু, পুতনু, মিকাই, তুতুল সেখানে যেমন ছিল তেমনি শুয়ে আছে। কেমনভাবে যেন তুতুলের পেটের সেফটিপিনটা আলগা হয়ে খানিকটা তূলো সেখান থেকে বেরিয়ে আছে!

হার্মাদ

আজকের কথা নয়, ইংরাজের রাজত্ব তখনও সুরু হয়নি। মুসলমানদের রাজপ্রতাপ অস্ত যায় যায় হয়েছে। দেশময় গোল। যে যার পারে লুট করে খায়—দেশে না আছে শাসন, না আছে শান্তি। তখনকার কথা বলছি।

কর্ণফুলি নদীর ধারে মাঝারি একটি গ্রাম; নাম রঙ্গনা।

রঙ্গনার লোক সবাই সেদিন নদীর ধারে ভেঙে পড়েছে। রঙ্গনার সবচেয়ে ধনী সদাগর উজ্জ্বল সাধু তিন ছেলে নিয়ে বাণিজ্যে যাবেন। সাত সাতটা ডিঙা নদীর ধারে সেজেছে। তার কোনটা ময়ূরপঙ্খী, কোনটা মকরমুখী, কোনটার মাথায় পরীর মূর্তি, কোনটার বা রাজহাঁসের।

বাণিজ্যে যাওয়া তখন সোজা নয়। জলপথে একবার গেলে ফেরবার আশা কম। জল-ঝড় ত' আছেই তার উপর জলদস্যুর উৎপাত। উজ্জ্বল সাধুকে গাঁয়ের লোকে অনেক নিষেধ করেছে কিন্তু উজ্জ্বল সাধু চিরদিন একরোখা—ভয়-ডর বলে কিছু জানেন না। তিনি কারুর কথা শোনেননি। তিনি বলেছেন—সদাগরের বংশ আমরা, সাত সমুদ্দুর চষে বেড়ানই আমাদের জাত-ব্যবসা, আমাদের কি ভয়-ডর করলে চলে?

ডিঙা প্রস্তুত, সাজগোজ সব শেষ। বাড়ীর মেয়েদের পান-সুপারী দূর্বা-চন্দন দিয়ে নৌকা বরণ করা হয়ে গেছে। মাঝিরা দাঁড়ে বসেছে।

উজ্জ্বল সাধু ময়ূরপঙ্খীতে উঠে নোঙর তুলবার আদেশ দিতে যাবেন, এমন সময় তাঁর মনে হল—ছোট ছেলে বসন্তকে ত' দেখা যায়নি অনেকক্ষণ।

উজ্জ্বল সদাগরের তিন ছেলে। রূপকুমার, কাঞ্চনকুমার আর বসন্তকুমার।

লোকে বলত—তিনটি ছেলে রূপে গুণে যেন তিনটি রত্ন। কিন্তু উজ্জ্বল সাধু ভুরু কুঁচকে বলতেন—উঁহু, বসন্তটা ষাঁড়ের গোবর।

বসন্তকে পছন্দ না করবার তাঁর কারণ ছিল। রূপকুমার, কাঞ্চনকুমার বাপের মত, যেমন জোয়ান, তেমনি সাহসী। কোন দেশে গিয়ে কেমন করে বাণিজ্য করবে, এই হল তাদের সারাক্ষণের চিন্তা, আর বসন্ত এ সবের বিপরীত—সদাগরের ছেলে হয়ে সে কিন্তু রাতদিন পুঁথিপত্র নিয়েই ব্যস্ত। দেখতে নেহাৎ দুর্বল রোগা সে নয় বটে, কিন্তু দাদাদের মত লম্বা-চওড়া চেহারাও তার নয়। মাথাটি তার বামুন পণ্ডিতের মত মুড়নো, তার মাঝখানে মস্ত বড় এক টিকি।

উজ্জ্বল সাধু রাগ করে বলতেন—তালপাতার পুঁথি পড়ে পড়ে ঐ টিকি একদিন তালগাছ হবে, দেখিস!

ভায়েরাও বাবার দেখাদেখি তাকে ঠাট্টা করতে ছাড়ত না। ছোট ভাইকে তারা বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু বসন্তর তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

বরাবর রূপ আর কাঞ্চনই বাপের সঙ্গে বিদেশে যায়। এবার উজ্জ্বল সাধু জোর করে বসন্তকে নিয়ে চলেছেন—বিদেশে-টিদেশে ঘুরে যদি তার পুঁথি পড়ার ব্যারাম সারান যায়, সেই আশায়।

ছোট ছেলেকে এখন না দেখতে পেয়ে তিনি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় গেল বসন্ত?

কেউ তা' জানে না। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। কিন্তু বসন্তকে পাওয়া গেল না। কোন ডিঙাতেই সে ওঠেনি।

নৌকা ছাড়তে দেরী হয়ে যাচ্ছে, উজ্জ্বল সাধু রেগেই খুন বললেন—সে নিশ্চয়ই বিদেশে যাবার ভয়ে কোথাও পালিয়েছে।

লোকজনকে ডেকে বললেন—যেখানে আছে, যেমন করে পার খুঁজে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এস। আমার ছেলে এমন ভীতু—ছি, ছি, আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করছে যে।

কিন্তু বসন্ত পালায়নি। লোকজন নৌকা থেকে নেমে খুঁজতে যাবে, এমন সময় দেখা গেল, দু'বগলে দুটি পুঁটলি নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে সে আসছে।

উজ্জ্বল সাধু ধমক দিয়ে বললেন—কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

বসন্ত মাথা নীচু করে বললে—আজ্ঞে, একটা পুঁথি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

—পুঁথি ? বাণিজ্যে যাবি তা' তোর পুঁথির কি দরকার ?

রূপকুমার, কাঞ্চন কুমার ও নৌকার সব লোক হেসে উঠল। বসন্তের মুখে আর কথা নেই।

উজ্জ্বল সাধু বললেন—কি আছে তোর পুঁটলিতে? খোল, দেখি।

কি আর করে! বসন্ত ধীরে ধীরে পুঁটলি দুটি খুললে। পুঁটলির ভেতর একরাশ পুঁথি।

উজ্জ্বল সাধুর আর সহ্য হল না।—দাঁড়া, তোর পুঁথি পড়া আমি বার করছি। বলে দুটি পুঁটলি, তিনি ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিয়ে হাঁকলেন—তোল নোঙর।

বসন্ত চমকে চীৎকার করে উঠে হতভম্ব হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। নৌকার লোক সবাই হেসে উঠল।

হালকা তালপাতার পুঁথি, জলে পড়েও তা' ডোবেনি। বসন্তের মনে হল, এখনও জলে নেমে সেগুলো তুলে আনা যায়। কিন্তু উপায় নেই, নোঙর তুলে ডিঙার সার তখন এগুতে সুরু করেছে।

নানা দেশ নানা বন্দর হয়ে ডিঙা যায়। কিন্তু বসন্তের মনে সুখ নেই। শুধু পুঁথির শোকেই সে যে বিষণ্ণ তা' নয়, নৌকার কেউ

হার্মাদ

তাকে আমল দেয় না, দাদারা সব সময়ে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, এও তার বড় দুঃখ।

বসন্ত নৌকার হালের কাছে গিয়ে বসে হয়ত বলে—দাও না, শ্রীধর, আমি একটু হাল ধরি।

শ্রীধর মাঝি একটু হেসে বললে—একি আপনার কাজ, ছোট কর্তা!

বসন্ত তবু জেদ করে বললে—না না, আমি তোমার দেখে দেখে শিখেছি যে!

শ্রীধর গম্ভীর হয়ে বলে—না না, ছোট কর্তা, তা' কি হয়? শেষকালে নৌকো সামলান দায় হবে।

রূপ আর কাঞ্চন ত' সুবিধে পেলে বসন্তকে অপ্রস্তুত করতে ছাড়েই না।

মাঝরাতে বসন্ত ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ দু'ভাই শশব্যস্তে এসে তাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলে—ওঠ ওঠ শীগগির, ডিঙায় "হার্মাদ" আসছে।

হার্মাদের নাম শুনে বসন্ত ধড়মড় করে উঠে বসে। হার্মাদ সে চোখে কখনও দেখেনি, কিন্তু মাঝি-মাল্লা সকলের কাছে এই বিদেশী জলদস্যুদের নির্মমতার কাহিনী শুনে শুনে তাদের সম্বন্ধে তার ধারণা আর অস্পষ্ট নেই। বাঘের চেয়ে হিংস্র, সাপের চেয়েও খল এই মানুষের চেহারার পিশাচেরা যেখানে নামে, সেখানে কি সর্বনাশই যে করে, তা' স্মরণ করে শিউরে উঠে বসন্ত বলে—কি করব দাদা?

রূপ আর কাঞ্চন তার হাতে একটা বল্লম গুঁজে দিয়ে বলে—তুই চুপি চুপি ওপরে উঠে গিয়ে মাঝিদের সব জাগিয়ে দিগে যা, আমরা নীচে থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছি। যা তাড়াতাড়ি যা, হার্মাদদের সুলুপ এসে পড়লো বলে, আমরা দূর থেকে আলো দেখে নেমে এসেছি।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে বসন্ত বল্লম হাতে নৌকার খোল থেকে উপরে উঠে যায়। অন্ধকার রাত। নদীতে নোঙর ফেলে পাটাতনের উপর যে যার জায়গায় মাঝিরা ঘুমোচ্ছে, শুধু হালের কাছে একজন প্রহরী পাহারায় দাঁড়িয়ে।

বসন্ত সামনে যাকে পায় প্রাণপণে ঠেলা দিয়ে বলে—ওঠ ওঠ, হার্মাদ আসছে।

হার্মাদের নাম শুনে সে এবং আরো তু'একজন ধড়মড় করে উঠে পড়ে। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে একজন হেসে উঠে বলে, কে, ছোট কর্তা নাকি? তাই ত' ভাবি এত রাতে হার্মাদ এল কোথা থেকে? তা' আসুক না হার্মাদ! আপনার ভয় নেই, আমরা আছি। আপনি ঘুমোন গে যান!

বসন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে—কী বাজে বকছ! হার্মাদদের স্লুপের আলো দেখা গেছে, শীগগির ওঠ সব।

মাঝিরা সবাই হেসে ওঠে।

একজন বলে—হার্মাদরা আপনার বল্লম দেখে পালিয়েছে কর্তা, এ রাত্রে আর আসবে না।

বসন্ত আরো কিছু হয়ত বল্‌ত, কিন্তু পেছনে হাসির শব্দ শুনে দেখে রূপ ও কাঞ্চন হাসির চোটে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছে।

এইবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে বসন্ত মাথা নীচু করে নীচে নেমে যায়।

একদিন কিন্তু রূপ ও কাঞ্চনের ঠাট্টা সত্যি হয়ে উঠবে কে জানত! সদাগরের বাণিজ্য শেষ হয়েছে। সাতটি ডিঙা নানা বন্দর নানা দেশ ঘুরে দেশের মুখে চলেছে। দিন দশেক বাদেই দেশে ফিরতে পারে জেনে মাঝিদের আর আনন্দের সীমা নেই। কর্ণফুলির মুখে হার্মাদদের ভয়—সে উজানটাকে নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসে তাদের আশা

ও সাহস বেড়ে গেছে। সকলেরই ধারণা এ দফায় আর বিপদ ঘটবে না।

এমন সময় একদিন তুপুরবেলা বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল!

বিস্তীর্ণ নদীব এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। তারই মাঝখান দিয়ে সদাগরের সাত ডিঙা চলেছে। হঠাৎ সামনের মকরমুখো ডিঙার দাঁড় টানা বন্ধ হয়ে গেল। মকরমুখো থেকে কে হেঁকে বললে—খবরদার, সামনে লুঠ হচ্ছে। সব নৌকার মাঝি-মাল্লা উদগ্রীব হয়ে ছুটে এল! দেখা গেল, সামনে কোন হতভাগ্য সদাগরের তিনটি নৌকায় আগুন ধরেছে। নদীর মাঝখানের সেই তিনটি জ্বলন্ত নৌকা থেকে অসহায় মাঝি-মাল্লা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কিন্তু জলে পড়েও তাদের নিস্তার নেই। পাঁচ পাঁচটি জলদস্যুদের স্লুপ থেকে জলের লোকদের উপর নির্মমভাবে হার্মাদরা তীর ছুঁড়ছে।

উজ্জ্বল সাধুর সাত ডিঙায় সোরগোল পড়ে গেল। উজ্জ্বল সাধু পাগলের মত ছুটোছুটি করতে করতে মাঝিদের নৌকার মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে যাবার ব্যবস্থা বলে দিতে লাগলেন। নৌকার খোল থেকে অস্ত্রশস্ত্র সব উপরে এনে মাঝিদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হল। তারপর নৌকার মুখ ফিরিয়ে প্রাণপণে সবাই দাঁড় টানতে লেগে গেল। হার্মাদরা অনুসরণ সুরু করবার আগে কিছুদূর এগিয়ে যেতে পারলে হয়ত এযাত্রা রক্ষা পাওয়াও যেতে পারে।

কিন্তু তা' হবার নয়। হঠাৎ সমস্ত নদী কাঁপিয়ে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। হার্মাদরা এ ডিঙা আক্রমণ করার আয়োজন করছে। উজ্জ্বল সদাগর চীৎকার করে বললেন—প্রাণপণে দাঁড় টান মাঝিরা সব, এযাত্রা বাঁচলে সবাই ডবল মাহিনা পাবে।

কিন্তু মাঝিদের কোন পুরস্কারের লোভ দেখাবার দরকার ছিল

না। তারা প্রাণের দায়ে তখন সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় টানছে। হার্মাদদের স্লুপগুলি তখন একসার হয়ে অনুসরণ আরম্ভ করেছে। বহুদূর পর্যন্ত এইভাবে অনুসরণ চলল। হার্মাদদের নৌকাগুলি তখনও সমানে পেছনে আছে কিন্তু মাঝিরা কতক্ষণ এক নাগাড়ে প্রাণপণে টানতে পারে? হার্মাদদের নৌকায় লোকবল অনেক বেশী। দেখা গেল, তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি আর তাদের এড়ানো গেল না। তারা প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে তখন এসে পড়েছে। সদাগরের সাত ডিঙার উপর তারা সেকালের গাদা বন্দুক ছুঁড়তে সুরু করল। সদাগরের ডিঙায় মাত্র একটি বন্দুক। উজ্জ্বল সাধু নিজে সেই বন্দুক ছুঁড়ে তাদের গুলির জবাব দিলেন। কিন্তু এমন করে আর কতক্ষণ চালান যায়? দেখতে দেখতে বড় বড় মশাল জ্বেলে হার্মাদরা তাদের স্লুপগুলি একেবারে সদাগরের সাত ডিঙার মাঝখানে নিয়ে এসে ফেলল এবং বড় বড় কাছি দিয়ে সদাগরের ডিঙাগুলির সঙ্গে তাদের স্লুপ শক্ত করে বেঁধে তরোয়াল ও বন্দুক নিয়ে নৌকার উপর লাফিয়ে পড়ল।

এইবার যে ব্যাপার সুরু হল তার আর বর্ণনা হয় না। তখনও ভালো করে সন্ধ্যা হয়নি। আকাশের আবছা আলোয় কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু হার্মাদদের মশালের আলোয় চোখে এমন ধাঁধাঁ লাগে যে, অন্ধকার আরো গাঢ় মনে হয়। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে মশালের লাল আলোয় বিস্তীর্ণ নদীর উপরে অসংখ্য মানুষের চিৎকার, তরোয়ালের সঙ্গে তরোয়ালের ঝঞ্জনা, বন্দুকের আওয়াজ মিলে এক ভয়ঙ্কর জগৎ সৃষ্টি করে তুলল। হার্মাদদের বিশাল যমদূতের মত চেহারা, গায়ে তাদের লাল কোর্তা, মাথায় কারও কালো টুপি, কারও কাপড় দিয়ে আঁট করে চুল পেছনে টেনে বাঁধা, পরণে তাদের রক্তাক্ত

হার্মাদ

পেণ্টুলুন। সংখ্যায় তারা যেমন বেশী, অস্ত্রশস্ত্রও তাদের তেমনি জবর—তাদের অধিকাংশের কাছেই বন্দুক ও পিস্তল। হাতাহাতি লড়াইয়ে আপাততঃ সে বারুদগাদা পিস্তল ছোঁড়ার বিশেষ সুবিধা না হলেও সদাগরের ডিঙার লোকেরা তাদের হিংস্র আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারছিল না। দলে দলে ডিঙার লোক মারা পড়ছিল। দেখতে দেখতে সদাগরের মকরমুখো ডিঙায় হার্মাদরা আগুন ধরিয়ে দিলে। নদীর জল সে আলোয় লাল হয়ে উঠল। উজ্জ্বল সাধু এবার বন্দুক ফেলে উন্মত্ত হয়ে তরোয়াল নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন। কিন্তু শ্রীধর মাঝি, রূপ ও কাঞ্চন মিলে তাঁকে জোর করে ধরে রাখলে। শ্রীধর বললে—আর যুদ্ধ করে লাভ কি বলুন? এবার আত্মসমর্পণ না করে আর উপায় নেই।

কিন্তু উজ্জ্বল সাধু আত্ম-সমর্পণ করতে কিছুতেই রাজি নন—হার্মাদদের বন্দী হয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে মরাই ভালো বলে তিনি তাদের হাত ছেড়ে দিতে বললেন। শ্রীধর তবু বুঝিয়ে তাঁকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় দুজন হার্মাদ হঠাৎ সেদিকে এগিয়ে এসে তাদের আক্রমণ করলে। রূপ বন্দুকটা তুলতে গিয়ে দেখে বন্দুক নেই, কখন কে সরিয়ে নিয়েছে, কেউ দেখেনি। শ্রীধর ও উজ্জ্বল সাধু তরোয়াল তুলে ধরলেন। উজ্জ্বল সাধুর তরোয়ালের ঘায়ে একজন হার্মাদের হাতের অসি পড়ে গেল, কিন্তু আর এক ঘায়ে শ্রীধরকে অস্ত্রচ্যুত করে উজ্জ্বল সাধুর মাথার উপর তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল। হঠাৎ গুড়ুম করে শব্দ। হার্মাদের হাতের তরোয়াল হাতে রয়ে গেল, সে ডিঙার উপর পড়ে গেল। আর একজন হার্মাদ তখন মাটি থেকে একটা বল্লম তুলে নিয়ে উজ্জ্বল সাধুর বুক লক্ষ্য করে ছোঁড়বার উদ্যোগ করছে। কিন্তু তারও হাতের বল্লম হাত থেকে আর ছুটল না—আবার এক বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সে লুটিয়ে পড়ল।

উজ্জ্বল সাধু অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—কোথা থেকে কে ছুঁড়ছে, কিছুই দেখা যায় না। বেশীক্ষণ অবশ্য খোঁজবার সময়ও তাঁর রইল না। হার্মাদরা এইবার চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলে। সদাগর মরিয়া হয়ে লড়বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় শ্রীধর জোর করে একটা সাদা নিশানা তুলে দোলাতে লাগল।

সাদা নিশান মানে সন্ধি, কিন্তু হার্মাদের কাছে সাদা নিশান মানে আত্ম-সমর্পণ। সাদা নিশান দেখবামাত্র অন্য সমস্ত ডিঙাতেও যুদ্ধ থেমে গেল। হার্মাদরা এইবার এগিয়ে এসে দড়ি দিয়ে শক্ত করে সকলকে বেঁধে ফেলতে লাগল।

উপায়হীন হয়ে উজ্জ্বল সাধু হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু যে হার্মাদ তাঁকে বাঁধতে এসেছিল হঠাৎ আর এক বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গেল।

সাদা নিশান দেখবার পরও বন্দুক ছোঁড়ে কে ?

সবাই কৌতূহলী হয়ে চারিদিকে চেয়ে হঠাৎ দেখতে পেল, নৌকার মাস্তুলের একেবারে আগায় পা ঝুলিয়ে একজন বন্দুক নিয়ে বসে আছে। একজন হার্মাদ তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরতেই মাস্তুল থেকে আবার এক আওয়াজ হল। হার্মাদের বন্দুক ছোঁড়া জীবনের মত শেষ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সাদা নিশান দেখবার পরও এ রকম বন্দুক ছোঁড়ায় হার্মাদরা একেবারে ক্ষেপে উঠল। তারা সবাই সেইদিকে বন্দুক উঁচিয়ে তাকে গুলি করবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে হার্মাদদের সর্দার গঞ্জালেস এগিয়ে এসে হাত নেড়ে বললেন—থাম, গুলি করে মারলে ওর অপরাধের উচিত শাস্তি হবে না, ওকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে আগি কুকুর দিয়ে খাওয়াব। ওকে জীবন্ত নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তিন তিনজন হার্মাদ তৎক্ষণাৎ মাস্তুল বেয়ে উপরে উঠতে গেল, কিন্তু

বেশীদূর তাদের উঠতে হল না। এক এক করে তিনজনেরই মৃতদেহ মাস্তুলের তলায় লুটিয়ে পড়ল। আরও তিনজন তারপর মাস্তুলে উঠতে গিয়ে সেই দশাই প্রাপ্ত হল। গঞ্জালেস উন্মত্ত হয়ে বললেন—মাস্তুলটা কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেল! মাস্তুলের তলায় তৎক্ষণাৎ হার্মাদরা কুড়ুল নিয়ে এসে কোপ দিতে সুরু করলে। দেখতে দেখতে মড় মড় করে মাস্তুল ভেঙে জলে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মাস্তুলের বন্দুকবাজও জলে ছিটকে গেল। ক'জন হার্মাদ এবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরবার জন্যে সাঁতরে গেল। তিনজনের হাত থেকে সাঁতরে পালান সহজ নয়। বন্দুকবাজ ধরা পড়ল। হার্মাদরা তাকে সেই জলে-ভেজা অবস্থায় পিছমোড়া করে উপরে তুলে নিয়ে এল। লোকটা এতক্ষণ মাথা নীচু করেছিল—হঠাৎ উপরে এসে মুখ তুলতেই উজ্জ্বল সাধু, রূপ, কাঞ্চন, শ্রীধর সবাই একসঙ্গে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন—একি, এ যে বসন্ত!

গঞ্জালেস বসন্তর মাথার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে বললেন—তোমার হাতের ভারি তাগ, না ছোকরা? আচ্ছা আগুনে একবার সেঁকে নিয়ে তারপর দেখা যাবে কত তুমি তাগ করতে পার।

উজ্জ্বল সাধু হাত বাড়িয়ে কি বলতে গেলেন, কিন্তু একজন হার্মাদ তাঁর মাথায় এক আঘাত করে তাঁকে নীরব করিয়ে দিল। হার্মাদরা বসন্তকে বেঁধে নীচে নিয়ে গেল।

গভীর রাত। নৌকার খোলের ভিতর এক জায়গায় বসন্তকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। হার্মাদরা জানিয়ে গেছে, কাল সকালে তাকে পুড়িয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়ান হবে।

লুঠ সফল হওয়ায় আনন্দে উপরে হার্মাদরা হল্লা করে ফূর্তি করছে। তারই আওয়াজ অস্পষ্টভাবে নীচে এসে পৌঁচাচ্ছিল, আর বসন্ত ক্ষোভে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে গুমরে উঠছিল। সে সকালে

মারা যাবে তার জন্যে তার দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু এই জন্যে যে, এই নরপিশাচদের উপযুক্ত শাস্তি সে দিতে পারল না! আরো ক'টাকে মেরে মরতে পারলে তার মনে শান্তি হ'ত। কিন্তু আর উপায় নেই।

হঠাৎ তার মনে হল, উপায় কি সত্যিই নেই? হার্মাদরা সব স্ফূর্তিতে মেতেছে, তার কাছে কেউ নেই; কোন রকমে হাতের বাঁধন যদি সে খুলতে পারে, তাহলে নৌকার জানলা দিয়ে বাইরে যাওয়া শক্ত নয়। একবার বাইরে বেরুতে পারলে হার্মাদদের আরো গোটাকতককে সাবাড় করবার সুবিধা মিলবেই, কিন্তু হাতের বাঁধন পায়ের বাঁধন খোলা যায় কি করে? যে কোন একটা ধারাল জিনিস থাকলে কোন রকমে তাতে ঘসে বাঁধন কাটা যেত। নৌকার খোলে একটি তেলের বাতি মিট মিট করে জ্বলছে, তার আলোয় চারদিকে চেয়ে তেমন কিছুই সে দেখতে পেল না।

নাঃ, উপায় নেই। প্রতিশোধ ভালো করে না নিয়েই তাকে পুড়ে মরতে হবে। এই কথা মনে হতেই হঠাৎ পিছমোড়া করে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও বসন্ত উঠে বসল। উপায় ত' আছে। পুড়ে মরার কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল বাতির আলোতে বাঁধন সে পুড়িয়ে ফেলতে ত' পারে! এখন কেউ না দেখতে পেলে হয়। কোন রকমে ঘসড়ে ঘসড়ে কি কষ্টে যে সে বাতির কাছে পৌঁছাল, তা' বলা যায় না। কিন্তু এখন আর এক অসুবিধা। কোন রকমে উঠে দাঁড়াতে হয়ত সে পারে, কিন্তু পেছন দিকে ভালো করে দেখা ত' যায় না। হাতের বাঁধন পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত হাত পুড়ে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার সময় আর নেই। ক্ষিপ্র হাতে পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে বসন্ত খোলের জানলা দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এসে জলে নেমে পড়ল। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের যন্ত্রণায় প্রথমে মনে হল সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে

যাবে। কয়েক মিনিটে সে যন্ত্রণা একটু সামলে নিয়ে নৌকার ধার দিয়ে নিঃশব্দে সাঁতরে যেতে যেতে সে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিল। সমস্ত হার্মাদ খাস-নৌকার উপর উৎসবে মত্ত। একজন শুধু হাল ধরে নদীর স্রোতে ধীরে ধীরে নৌকা চালিয়ে নিয়ে চলেছে। অপর নৌকাগুলিতেও দু'টি একটির বেশী মাঝি নেই। অন্ধকার রাত্রি, নদীর উপর একহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। আস্তে আস্তে সাঁতরে গিয়ে হালের কাছে বসন্ত আবার নৌকা ধরল তারপর ধীরে ধীরে নৌকার গা বেয়ে উপরে উঠে গেল। হালে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে একজন মাত্র হার্মাদ নৌকা চালাচ্ছে। কাছে কেউ কোথাও নেই। এই একজনকে কাবু করতে পারলেই হয়, কিন্তু কেমন করে তা' সম্ভব। গায়ে তার অত জোর নেই যে, এই যমদূতের মত চেহারাকে শুধু হাতে মেরে ফেলতে পারে। অস্ত্রশস্ত্রও তার সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কোন রকমে হার্মাদ-মাঝির কোমরবন্ধ থেকে তার তরোয়ালটা খুলে নেওয়া যায়! মাঝির পিছনে গুড়ি মেরে বসে বসন্ত নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে দেখলে, সে তরোয়াল নেওয়া শক্ত। লোকটা ঝিমোচ্ছে কিন্তু একেবারে ঘুমোয়নি। বসন্ত বসে বসে উপায় ভাবতে লাগল।

হঠাৎ বিধাতাই সুযোগ করে দিলেন। লোকটা ঝিমোতে ঝিমোতে একবার ঘুমের ঘোরে সামনে টলে পড়ল। সেই মুহূর্তে তার কোমর থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে বসন্ত উঠে দাঁড়াল। কোমরে টান পড়ায় হার্মাদও সজাগ হয়ে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু তখন তার সময় ফুরিয়েছে। এক কোপে তার ছিন্ন মুণ্ড ঘাড় থেকে পেছনে ঝুলে পড়ল। লাশটা থেকে তার জামা কাপড় খুলে নিয়ে বসন্ত লাশটা একধারে চাপা দিয়ে রেখে দিল। জামা পেণ্টুলুন সে পরল বটে, কিন্তু তার গায়ে সেগুলি ঢলঢল করতে লাগল, তা' হোক তবু

দূর থেকে দেখে চিনতে পারা যাবে না। এবার কি করবে, সেই হল সমস্যা। কোন রকমে নৌকাটাকে তীরের কাছে নিয়ে কোন চড়ায় ঠেকিয়ে দিতে পারলে কাজ হয়। তীর কতদূর না জেনেও সে ধীরে-ধীরে নৌকার হাল ঘুরিয়ে দিল। অধিকাংশ হার্মাদ স্ফূর্তি করবার জন্যে সদাগরের বড় ময়ূরপঙ্খীতে এসে জড়ো হয়েছে। এই নৌকাতেই সদাগরের সমস্ত মাঝি-মাল্লা লোকলস্কর বেঁধে রাখা হয়েছে। নৌকাগুলিতে শুধু দরকার মত দু'একজন ছাড়া আর কেউ নেই। নৌকা চরেতে লাগলে হার্মাদরা কয়েকজন নীচে নামবেই—নৌকা ঠেলে জলে ভাসাতে। সেই সময় কিছু না কিছু করা যাবে।

চর সত্যই বেশী দূর ছিল না। হঠাৎ সশব্দে নৌকা চরে ঠেকে থেমে গেল। নৌকা অনেকখানি উপরে উঠে গেছে। হার্মাদরা ভীড় করে নৌকার পাটাতনের উপরে এসে দাঁড়াল। গঞ্জালেস ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—এই কুকুর সিবাষ্টিয়ান! নৌকো চরে ঠেকল কেন?

মুখে কাপড় পুরে যথাসম্ভব ভারী গলায় হার্মাদদের স্বর অনুকরণ করে বসন্ত বললে—কসুর হয়ে গেছে সর্দার—টের পাইনি।

অন্য সময়ে হলে কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু এ সময়ে গঞ্জালেসের মেজাজ ভালো ছিল। আর কিছু না বলে তিনি আদেশ দিলেন—শীগগির নেমে গিয়ে নৌকা ঠেলে জলে ভাসাও।

হার্মাদেরা সবাই মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়ে ছিল। আদেশ পাওয়া মাত্র হুড়মুড় করে প্রায় নীচে নেমে গেল। এতটা বসন্ত আশা করেনি, এইবার সুযোগ।

গঞ্জালেস নৌকার ধারে গিয়ে মাথা নীচু করে হার্মাদদের কি করতে হবে, চীৎকার করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মৃত সিবাষ্টিয়ানের কোমরের ছোরাটা খুলে নিয়ে বসন্ত নিঃশব্দে গঞ্জালেসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল;

তারপর প্রাণপণে জোর সংগ্রহ করে পিঠে ছুরি বসিয়ে দিলে। গঞ্জালেস কথাটি পর্যন্ত না কয়ে তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়লেন। নীচে হার্মাদরা নৌকা ঠেলায় ব্যস্ত, তারা কিছুই জানতে পারলে না। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে বসন্ত নীচে নৌকার খোলে যেখানে তার বাবা, ভাই এবং মাঝি-মাল্লারা বন্দী হয়ে ছিল—সেখানে নেমে গিয়ে একে একে সকলের বাঁধন কেটে দিয়ে বললে—যা পার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শীগগির নৌকোর ধারে এস।

হার্মাদরা প্রায় তখন নৌকা ঠেলে জলে নামিয়ে এনেছে। জলে ভাসবামাত্র যেই হার্মাদরা উপরে উঠতে যাবে, অমনি তাদের সংহার করতে বলে, বসন্ত আবার গিয়ে হাল ধরলে।

কিছুক্ষণ বাদেই হার্মাদদের ঠেলায় নৌকা জলে ভাসল। তৎক্ষণাৎ হাল ঘুরিয়ে বসন্ত নৌকার মুখ তীর থেকে ফিরিয়ে দিলে। হার্মাদরা প্রথমটা থতমত খেয়ে তারপর নৌকায় উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সেখানে সমস্ত সদাগরের মাঝি-মাল্লা তরোয়াল-বল্লম-বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে ক'জন এ সত্ত্বেও উঠবার চেষ্টা করল তাদের পরিণাম দেখে অন্যান্য দস্যুরা আর সে চেষ্টা করতে সাহস করলে না। নৌকার মুখ ফিরিয়ে বসন্ত কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে একেবারে হার্মাদের নাগালের বাইরে এনে ফেললে।

হার্মাদদের অন্যান্য নৌকা অন্ধকারে এসব কিছুই জানতে না পেরে অন্যদিকে চলে গেছে। সামনে আর কোন বিপদ নেই। ধনরত্ন ও ক'টা নৌকা গেছে যাক, প্রাণ বাঁচাতে পেরে মাঝি-মাল্লাদের তখন আর আনন্দের সীমা নেই। তারা বসন্তকে নিয়ে কি যে করবে যেন ভেবে পায় না।

রূপ আর কাঞ্চন শুধু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তোর বন্দুকের অত তাগ হল কবে রে—তুই শিখলি কোথায়?

বসন্ত হেসে বললে—বন্দরে নেমে বেসাতি করতে যাবার সময় আমাকে ত' সঙ্গে নিতে না, আমি তখন কোন কাজ না পেয়ে বাবার বন্দুক নিয়ে ছোঁড়া অভ্যাস করতাম।

উজ্জ্বল সাধু ছেলের কাছে এসে তার পিঠ চাপড়ে আদর করে বললেন—তুই যা করেছিস তার পুরস্কার দেওয়া যায় না, তবু তুই যা চাস আমি দেব। বল কি চাস।

মাথা নীচু করে নৌকার উপর পা ঘসতে ঘসতে বসন্ত অস্পষ্ট স্বরে বলল—আমার সেই পুঁথিগুলো যদি······

সাগর দানব

পৃথিবীর চারটি বড় বড় দেশের উৎসাহে ও টাকায় একেবারে প্রথম শ্রেণীর একটি সাবমেরিন এখন অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমান দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে ডুব দিয়ে সাগরের জল প্রায় ক্ষ্যাপার মত ঘুলিয়ে তুলেছে বললে হয়। এটা তার খামখেয়াল নয়। পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের মতে, বিজ্ঞান ও মানুষের ভাবী ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুতর একটি সমস্যার সমাধান এই সাবমেরিনের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ওপর নির্ভর করছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের অতল জলে কি যে সাবমেরিনের বৈজ্ঞানিক নাবিকেরা খুঁজে ফিরছে, কেন যে মানুষের পক্ষে সেটা এমন গুরুতর ব্যাপার, সেই কাহিনীই বলছি।

ব্যাপারটা পৃথিবীর অনেক গুরুতর ঘটনার মতই আরম্ভ হয়েছিল অত্যন্ত নিঃশব্দে। চীন-জাপানের যুদ্ধ, স্পেনের বিপ্লব, ইউরোপের গণ্ডগোল নিয়েই তখন সবাই মত্ত। অষ্ট্রেলিয়ার দু একটা কাগজের কোণে যা সামান্য একটা খবর বেরিয়েছিল তার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েনি। যাদের পড়েছিল তারাও সেটাতে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

খবরটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে উগি নামে ছোট নগণ্য একটি দ্বীপের মালিক মিঃ বাফেট সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি সামুদ্রিক জীবের অস্তিত্বের পরিচয় পেয়ে কাগজে তার বিবরণ পাঠিয়েছিলেন। সেই বিবরণটিকে কেটে ছেঁটে খবরের কাগজের এক কোণে নেহাৎ জায়গা ভরাবার জন্যেই স্থান দেওয়া হয়েছিল। একরকম বিবরণ খবরের কাগজে হামেশাই আসে,

অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত আজগুবি গালগল্প বলে ধরা পড়ে। সুতরাং কাগজে এই বিবরণটিকে যে বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়নি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সাধারণ লোক ত' দূরের কথা, এ বিষয়ে যাদের উৎসাহ থাকার কথা সেই প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের কেউ এ বিবরণ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিল বলে মনে হয় না।

মিঃ বাফেট নিজেও তাঁর আবিষ্কারটির গুরুত্ব অবশ্য কিছুই বোঝেননি। সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা আগাগোড়া দুঃস্বপ্ন কিনা, এ বিষয়ে তাঁর নিজেরি একটু সন্দেহ ছিল।

মিঃ বাফেট উগি দ্বীপটি অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছে কিনে সেখানে নারকেলের চাষ করেছেন। নারকেলের চাষ ছাড়া আশে-পাশের দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে মুক্তো প্রবাল প্রভৃতি নানা জিনিসের কারবারও তিনি করে থাকেন।

উগি দ্বীপটি নিতান্ত ছোট, লম্বায় চওড়ায় বারো মাইলের বেশী কোথাও নয়। এই দ্বীপটিতে জন পঞ্চাশ সেই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা তাঁরই নারকেল বাগান ও কারবারে চাষী মজুর ও চাকরের কাজ করে।

ঘটনার দিন ছিল উগি দ্বীপের একরকম হাটবার। আশেপাশের দ্বীপগুলি, বিশেষ করে পাশের সান ক্রিষ্টোভাল দ্বীপ থেকে লম্বা লম্বা "ক্যানোয়" করে বড় বড় সর্দারেরা এসেছে মুক্তো আর প্রবাল, নারকেলের শাঁস আর গজদন্ত ফলের বদলে রঙিন ছিট, আর তামাক, সস্তা আয়না চিরুণী আর পুঁতির মালা কিনতে।

সারাদিন কেনাবেচা ও মুখ্য সর্দারের হিসেব বোঝবার পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মিঃ বাফেট বিকালবেলার ভাঙাহাটের ভার বিশ্বাসী চাকর টিকোর হাতে ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ধারে একটু মাথা ঠাণ্ডা করতে এসেছিলেন।

সন্ধ্যে তখনও হয়নি। প্রবাল দ্বীপের সমুদ্রতট দুধে ধোওয়া শ্বেত পাথরের মেঝের মত ঝক ঝক করছে। সমুদ্রের জলের রঙ শুধু একটু গাঢ় হয়ে এসেছে নারকেল সারির পিছনে অস্তমান সূর্যের মরা আলোয়।

মিঃ বাফেট উঁচু একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর গিয়ে বসেছিলেন। এইটেই তাঁর প্রিয় বিশ্রামের জায়গা। এখান থেকে দূরে সমুদ্র যেখানে ফেনা-ছিটানো শাদা ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়েছে সেদিকে চেয়ে থাকতে তিনি ভালোবাসেন।

অধিকাংশ প্রবালদ্বীপের মজা এই যে, চারিদিকে তৈরী ডুবো দেওয়ালে ঘেরা থাকায় তীরের কাছে ঢেউ-এর দাপট আর থাকে না। জলের ডুবো প্রবাল-প্রাকারের ধাক্কা খেয়ে নিস্তেজ হয়ে ঢেউগুলি সেখানে পৌঁছায়। সেই অপেক্ষাকৃত শান্ত জলে দুটি বড় বড় কচ্ছপের সাঁতরে বেড়ান অন্যমনস্কভাবে দেখতে দেখতে হঠাৎ মিঃ বাফেট চমকে উঠলেন। সমুদ্রের নীল জলের ভিতর থেকে রূপোর মত চকচকে কি একটা প্রাণী তীরের দিকে উঠে আসছে। প্রথমে মিঃ বাফেট সেটাকে একটা সামুদ্রিক মাছই ভেবেছিলেন। কিন্তু সে ভুল ভাঙতে তাঁর দেরী হল না। মাছের সঙ্গে তার সাদৃশ্যই নেই।

তবে প্রাণীটি কি? রঙটা রূপোর মত পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চক্‌চক্ করে না উঠলে গোড়ায় হয়ত আর একটি কচ্ছপ বলেও সেটাকে ভাবা যেত। মনে করা যেত তার আঁশগুলোই অমন চক্‌চক্ করছে। কিন্তু শুধু রঙে নয়, আকারেও ত' তার কচ্ছপের সঙ্গে কোন মিল নেই।

মিঃ বাফেট চোখটা একবার রগড়ে নিলেন। সারাদিন হিসেবের অঙ্ক লিখে লিখে চোখটা খারাপ হল নাকি? না, চোখ ত' খারাপ হয়নি। প্রাণীটি সত্যিই অদ্ভুত। দশ বৎসর ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপটিতে তিনি বাস করেছেন, তার আগেও প্রশান্ত মহাসাগরের

নানা দ্বীপে তাঁর অনেক দিন কেটেছে। এখানকার গাছপালা মানুষ ও জলস্থলের সব প্রাণীর প্রায় নাড়ি-নক্ষত্র তাঁর জানা। কিন্তু এমন প্রাণী তিনি কখনও দেখেননি।

প্রাণীটি তখন সমুদ্রের জল ছাড়িয়ে তীরের ওপর উঠে এসেছে। মাছত' নয়ই, কচ্ছপ বা হাঙর কোন কিছুর ধার দিয়েও সে যায় না। তার সঙ্গে মিল অবশ্য একটা কিছুর আছে, কিন্তু সে মিলের কথা ভাবতে যাওয়াটাই মনে হয় যেন মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ।

রূপোর মত ঝকঝকে প্রাণীটি ঠিক যেন একটা বিকৃত চেহারার কবন্ধ বামন। মানুষের মত মাথাটাই তার খালি নেই, কিন্তু ঠিক মানুষের মতই তার দুটি মোটা পা এবং দেহের দু'ধারে আজানু নয় একেবারে আপাদলম্বিত দুটি হাতের মত অঙ্গও তার আছে। দৈর্ঘ অবশ্য তার তিন ফুটের বেশী না হলেও পরিধি তার বেশ।

টলমল পায়ে প্রাণীটি তীরের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে—মিঃ বাফেট মন্ত্রমুগ্ধের মত সেদিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর বিশ্বাসী চাকর টিক্কো যে তাঁর খোঁজে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়াল তাঁর নেই। হঠাৎ তার ভীত চীৎকারে তিনি চমকে উঠলেন।

দানব! দানব! সমুদ্রের দানব!—মিঃ বাফেট মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, ভয়ে টিক্কো একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, শুধু চীৎকারের তার কামাই নেই।

সে চীৎকারের ফল যা হবার তাই হল। দেখা গেল প্রাণীটি দ্রুত-বেগে সমুদ্রের দিকে আবার ফিরে যাচ্ছে। মিঃ বাফেট তাড়াতাড়ি তার পিছনে যাবার উপক্রম করতেই টিক্কো একেবারে পাগলের মত তাঁকে জড়িয়ে ধরে সভয়ে বললে—দোহাই আপনার, যাবেন না। সমুদ্রের দানবের কাছে—তাহলে আর রক্ষা নেই।

টিক্কোর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে করতেই প্রাণীটি

যখন সমুদ্রের জলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন মিঃ বাফেটের আফশোষের আর সীমা রইল না। থমকে গালাগাল দিয়ে টিক্কোকে বললেন—আহাম্মক কোথাকার! কি করলি বল দেখি!

টিক্কোর কিন্তু গালাগালে লজ্জিত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ভয় তখনও তার সম্পূর্ণ কাটেনি। অম্লান বদনে তবু সে জানাল যে অন্যায় সে কিচ্ছু করেনি। সমুদ্রের দানবের পরিচয় জানলে সাহেব আর তার কাছে যাবার জন্যে ব্যস্ত হতেন না!

সমুদ্রের দানব না ছাই! মুখ্যু জানোয়ার কোথাকার! ভালো করে দেখতে পেলুম না তোর আহাম্মোকীতে!

টিক্কো এবার একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে—তার ভাবনা নেই। একবার যখন দানব এ দ্বীপে উঠেছে তখন ভালো করে দেখা না দিয়ে সে যাবে না। বলতে বলতে তার চোখে মুখে যে আতঙ্ক ফুটে উঠল তাতে মিঃ বাফেট সত্যি একটু অবাক হয়ত হতেন, যদি না এদের নানা অর্থহীন কুসংস্কার তাঁর জানা থাকত। তাই তিনি শুধু একটু হেসে তাকে বললেন—এ দানব তুই আগে দেখেছিস্?

টিক্কো জানালো—না, তার নিজের দেখা এই প্রথম, কিন্তু দানবের সব কথা সে জানে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপ নাকি ঝড় জল ভূমিকম্পে মহামারীতে নয়, এই দানবের অত্যাচারেই শ্মশান হয়ে গেছে আগে। অসভ্যদের বল্লম আর সাহেবদের গুলি, কিছুই নাকি এদের ক্ষতি করতে পারে না।

এ মূর্খ কুসংস্কারগ্রস্ত অসভ্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা বৃথা বুঝে মিঃ বাফেট বেশ একটু ক্ষুন্ন মনেই তার বাংলোয় ফিরেছেন এবং তারপর তিনি নিজে যা দেখেছেন তার বর্ণনার সঙ্গে অসভ্য অধিবাসীদের কুসংস্কার জড়িত কাহিনী সমেত একটি বিবরণ অষ্ট্রেলিয়ার কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কাটা ছাঁটা হয়ে তা' থেকে যেটুকু বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে তার পরিণামের কথা আগেই বলা হয়েছে। তারপর সভ্য জগৎ এই ব্যাপারটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কতদিনে যে সজাগ হয়ে উঠত কে জানে যদি না—

—যদি না সান্ ক্রিষ্টোভালের রেসিডেন্ট কমিশনার মিঃ সেরিফের কাছে উগি দ্বীপ সম্বন্ধে কয়েকটি ভাসা ভাসা গুজব গিয়ে পৌঁছাত, যদি না তিনি স্বয়ং এ ব্যাপারটার খোঁজ নেবার সাধু সঙ্কল্প করতেন, এবং যদি না ঠিক সেই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সামুদ্রিক প্রাণীতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক মিঃ মিচেল তাঁর বার্ষিক সাগর-শিকারে বেরিয়ে সান ক্রিষ্টোভালে মিঃ সেরিফের অতিথি হতেন।

মিঃ সেরিফ কিছুদিন থেকেই উগি সম্বন্ধে নানান রকম গুজব শুনতে পাচ্ছিলেন। উগি দ্বীপ সান ক্রিষ্টোভালের অধীন, সেখানকার মালিকও তাঁর জাতভাই। সেই হিসেবে উগি দ্বীপের মালিকের বিপদ-আপদে সাহায্য করা কমিশনারের কর্তব্য। তবু খবরগুলো এমন আজগুবি, এবং কমিশনার হিসেবে মিঃ সেরিফের অন্য কাজের চাপ এত বেশী যে এ বিষয়ে কিছু করার ফুসরৎ তাঁর এ পর্যন্ত হয়ে উঠেনি।

কিন্তু একদিন আর চুপ করে বসে থাকা তাঁর চলল না। সকাল বেলায় খাবার টেবিলেই তাঁকে অত্যন্ত চঞ্চল দেখে মিঃ মিচেল একটু আশ্চর্য হলেন—কি ব্যাপার মিঃ সেরিফ ? আপনাকে সকালেই যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে !

—চিন্তিত নয় ডাঃ মিচেল, বিরক্ত বলতে পারেন। একে ত' সরকারী কাজের এই চাপ, তার ওপর এদেশের লোকের ভূতের ভয়, জুজুর ভয় সারিয়ে বেড়াতে হলেই ত' গেছি !

—জুজুর ভয় আবার কোথায় সারাতে হবে ? ডাঃ মিচেল জিজ্ঞাসা করলেন।

—এই উগি দ্বীপে, আর কোথায়! সেখানকার মালিক মিঃ বাফেট শুনছি ভয়ানক নাকি বিপদে পড়েছেন। জুজুর ভয়ে তাঁর চুক্তি করা সমস্ত চাকরবাকর চাষী নাকি তাঁকে একা ফেলে পালিয়েছে। বেচারার সান ক্রিষ্টোভালে এসে খবর দেবার মত একটা ডিঙিও নাকি তারা রেখে যায়নি।

মিঃ সেরিফ একটু থেমে আবার বললেন—জুজুটা কি জানেন? সাগর দানব! সাগর থেকে তারা নাকি উঠে সব ধ্বংস করে দেয়। শুনেছেন এমন কথা!

ডাঃ মিচেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন—শুনেছি।

মিঃ সেরিফ একটু অধৈর্যের সুরে বললেন—শুনেছি আমিও। এ দেশে এ কুসংস্কার বহুকাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন এসব গাঁজাখুরি গল্প?

ডাঃ মিচেল তেমনি গম্ভীরভাবে বললেন—এইটুকু শুধু বিশ্বাস করি, যে গাঁজাখুরি গল্পের একটা কিছু সত্যের ভিৎ আছে।

মিঃ সেরিফ তাঁর দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলেন—তাহলে চলুন না মশাই আমার সঙ্গে। সত্যের ভিৎটা একটু খুঁড়ে আসবেন! অনেক রকম নতুন প্রাণী ত' আপনার সংগ্রহ হয়েছে, একটা সাগর দানবই বাদ যায় কেন? কেমন, যাবেন?

মিঃ সেরিফের ঠাট্টাটুকু উপেক্ষা করে ডাঃ মিচেল বললেন—আমি প্রস্তুত।

সেইদিন বিকালেই সান্ ক্রিষ্টোভাল থেকে সরকারী বড় মোটর-বোট "মিগুনি" উগি দ্বীপে গিয়ে নোঙর করল। মাঝি-মাল্লাদের বোটেই রেখে জনকয়েক দেশী কনেষ্টবল নিয়ে মিঃ সেরিফ ও ডাঃ মিচেল মিঃ বাফেটের বাংলোয় গিয়ে উঠলেন।

বাংলোয় পৌছে তাঁরা সত্যি অবাক হলেন। দেশী চাষী-মজুর,

চাকর-বাকর না হয় সব পালিয়েছে, কিন্তু স্বয়ং মিঃ বাফেট গেলেন কোথায় এই সন্ধ্যেবেলায় ! বাংলো এবং আশেপাশের সমস্ত জায়গা সন্ধান করেও তাঁর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। সরে পড়বার আগে দেশী লোকেরা কি তাঁকে শেষ করে দিয়ে গেছে তা' হলে ? কিন্তু আশ্চর্য ! গুদোম-ঘর বা বাংলোর কোন জিনিসপত্রই চুরি যায়-নি। মনিবকে মেরে ফেলে চাকরেরা সে সব লুট করবার লোভ নিশ্চয়ই সংবরণ করতে পারত না।

যাই হোক রাত্রিটা তাঁদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে। সকালের আগে আর মিঃ বাফেটের অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করার চেষ্টা বৃথা বুঝে রাত্রিটা তাঁরা বাংলোতেই নিশ্চিন্ত বিশ্রামে কাটাবার সঙ্কল্প করলেন।

কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে রাত্রিটা বিশ্রাম করে কাটান তাদের হল না।

সন্ধ্যা তখন সবে উত্তীর্ণ হয়েছে। কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে টেবিলের দু'ধারে বসে ডাঃ সেরিফ ও ডাঃ মিচেল সাগর দানবের কিম্বদন্তী সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

মিঃ সেরিফ বলছিলেন—সাগর দানব বলতে একটা কিছু আছে বলে আপনি কেন মনে করেন ডাঃ মিচেল ?

—মনে করি এই জন্যে যে প্রশান্ত মহাসাগরের নানা দ্বীপে সাগর দানবের কিম্বদন্তী বহুদিন থেকে চলে আসছে। তার সবটাই কুসংস্কার আর বাজে কল্পনা বলে আমার মনে হয় না।

—কিন্তু তা' হলে এতদিন সভ্য মানুষ তার খোঁজ পেত না, আপনাদের বিজ্ঞানও কিছু জানত না ?

ডাঃ মিচেল একটু হেসে বললেন—সভ্য মানুষ আর বিজ্ঞানকে সবজান্তা মনে করছেন কেন ? বিজ্ঞান ত' সেদিনের। পৃথিবীর রহস্যের এখনও অনেক কিছু সে জানবার সুযোগ পায়নি।

—কিন্তু সাগর দানব তা' হলে কি হতে পারে ?

—ঠিক করে কিছু বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার কোন রকম কল্পনাও সাজে না। তবে আমার অনুমান—সাগর দানব গভীর সমুদ্রের কোন অজানা প্রাণী।

ডাঃ মিচেলের কথা আর শেষ হল না। হঠাৎ বাইরে একটা অত্যন্ত গোলমাল শোনা গেল। দুজনে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়তেই একজন পুলিশ এসে জানালে একটি লোক লুকিয়ে বন্দুক বারুদ প্রভৃতি রাখবার ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছিল, তাকে ধরতে গিয়েই এই গোলমাল।

এই জনশূন্য দ্বীপে কেউ নেই বলেই ত' তাঁরা জানতেন। এখানে বারুদ ঘর লুট করার সখ আবার কার হল? ডাঃ মিচেল ও মিঃ সেরিফ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুলেন। কিন্তু চোরকে দেখেই তাঁদের চক্ষুস্থির।

—একি, এ যে মিঃ বাফেট !

জ্যোৎস্না রাত্রি হলেও বড় বড় নারকেল গাছের ছায়ায় বারুদ-ঘরের দিকটা বেশ অন্ধকার। তারই দরুণ পুলিশ মিঃ বাফেটকে চিনতে পারেনি। তারা এবার তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সসঙ্কোচে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। মিঃ বাফেটের কিন্তু তখনও রাগ যায়নি। তাঁকে ভয়ানক উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। চড়া গলায় তিনি বললেন—হ্যাঁ, আমি মিঃ বাফেট! আপনারা কে শুনতে পাই! পরের এলাকায় মাতব্বরী করতে এসেছেন !

উত্তর না দিয়ে মিঃ সেরিফ একটু আলোয় গিয়ে দাঁড়াতেই মিঃ বাফেটের সুর বদলে গেল। আপনি মিঃ সেরিফ ! আমি ভাবতেই পারিনি ! যাক্ ভালোই হয়েছে, ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন।

রাগ পড়ে গেলেও মিঃ বাফেটের উত্তেজনা তখনও একটুও কমেনি দেখা গেল।

মিঃ সেরিফ সেটুকু লক্ষ্য করে বললেন—তা' ত' এসেছি। কিন্তু আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথা? এত রাত্রে বারুদ-ঘরেই বা ঢুকছিলেন কেন?

—বারুদ-ঘরে ঢুকছিলাম গেলিগ্নাইট নেবার জন্যে। তারা এসে পড়েছে যে মিঃ সেরিফ! এসে পড়েছে! মিঃ বাফেটের ভাবভঙ্গি অনেকটা অপ্রকৃতিস্থের মত।

—কারা এসে পড়েছে? ডাঃ মিচেলই জিজ্ঞেস করলেন এবার।

—কারা আবার, সাগর দানব! সারাদিন আমি সেই পাহারাতেই ছিলাম। কিন্তু একটি দুটি নয়, দলে দলে তারা এসেছে। সেই জন্যেই বন্দুকের বদলে গেলিগ্নাইট নিতে এসেছি, আর সময় নেই মিঃ সেরিফ! গেলিগ্নাইট নিয়ে এখুনি আমাদের যাওয়া দরকার।

এবার মিঃ সেরিফের স্থির বিশ্বাস হল লোকজন পালাবার পর ক'দিন একা একা নির্জন দ্বীপে কাটিয়ে ভয়ে ভাবনায় মিঃ বাফেটের নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি মিঃ বাফেটকে একরকম জোর করে বাংলোর দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে বললেন—আসুক তারা। আমরা এখান থেকেই তাদের সঙ্গে লড়ব।

কিন্তু মিঃ বাফেট সজোরে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অধীরভাবে বললেন—আপনারা কি আমায় পাগল ভাবছেন! শুনুন এর আগেও তারা দুবার এখানে হানা দিয়েছে। আমাদের বন্দুকের জোরে অনেক কষ্টে তাদের তাড়িয়েছি। কিন্তু একটিকেও মারতে পারিনি। বন্দুকের গুলি যেন তাদের গায়ে লাগে না। আমার লোকজন কি অমনি পালিয়েছে মনে করেন? আপনারা কি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা!

মিঃ সেরিফ কি বলতেন কে জানে, কিন্তু ডাঃ মিচেল এগিয়ে গিয়ে বললেন—নিশ্চয় বিশ্বাস করছি। চলুন কোথায় যাবেন।

এ অঞ্চলের প্রায় সব দ্বীপেই বারুদ-ঘরে মাছ ধরা, পাহাড়-ভাঙা

প্রভৃতি কাজের জন্যে বেশ কিছু গেলিগ্নাইট রাখা হয়। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খালি টিনে সেই গেলিগ্নাইট ভরে পটকা ও পলতে লাগিয়ে গোটা কয়েক চলনসই বোমা তৈরী করা হল। তারপর মিঃ বাফেটের পিছু পিছু নারকেল বাগানের ভেতর দিয়ে সবাই তীরের দিকে চললেন।

কিন্তু বেশী দূর তাঁদের যেতে হল না। নারকেল বাগানের আবছা অন্ধকার যেখানে জ্যোৎস্নার আলোয় ধবধবে বালুতটে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পৌছাবার আগেই মিঃ বাফেট হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। আলো-ছায়ার সতরঞ্চ-কাটা ঘন নারকেল বনের পথে চকচকে কোন জিনিস প্রতিফলিত আলোর ঝিলিক তখন আরো অনেকে দেখতে পেয়েছে। সকলে রূদ্ধ নিঃশ্বাসে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামনের দৃশ্য সত্যই বিশ্বাসের অতীত। টলটলে পায়ে এক সার দিয়ে প্রায় কুড়িটি যে অপরূপ মূর্তি একবার ছায়ায় ঢাকা পড়ে, একবার চাঁদের আলোয় ঝলমল করে এগিয়ে আসছে, তারা সত্যই বাস্তব জগতের কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। তারা যেন প্রাচীন-কালের ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানার কোন কাল্পনিক কাহিনীর বই থেকে বেরিয়ে এসেছে।

মিঃ সেরিফ ডাঃ মিচেলের কাণে কাণে চুপি চুপি বললেন—এরা যে দু'পায়ে মানুষের মত হাঁটে, ডাঃ মিচেল! সমুদ্রে আবার এরকম প্রাণী কি আছে! আর সমুদ্রের প্রাণী ডাঙায় বা বাঁচে কি করে?

ডাঃ মিচেল নিজের হাতের বোমটা বাগিয়ে ধরে বললেন—সব রহস্যের এখনি মীমাংসা হবে।

কিন্তু মীমাংসা অত সহজে হল না। অপরূপ মূর্তিগুলি নাগালের মধ্যে এসে পড়তেই সকলে বোমার পলতেতে আগুন দিয়ে সেগুলি তাদের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। প্রচণ্ড শব্দে সেগুলি ফেটে যাবার পর দেখা গেল উদ্দেশ্য তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি।

ভীত প্রাণীগুলি তখন সবেগে সমুদ্রের দিকে পালাচ্ছে। মোটা মোটা টলটলে পায়ে তারা যে অত জোরে ছুটতে পারে তা' গোড়ায় ভাবা যায়নি।

তাদের অনুসরণ করবার চেষ্টা না করে বোমা যেখানে ফেটেছিল সেখানেই সকলে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা-আধটা মৃতদেহ নিশ্চয় সেখানে পড়ে আছে। ডাঃ মিচেলের আগ্রহ সেই বিষয়েই।

একেবারে আস্ত না হলেও গোটাকতক অসম্পূর্ণ লাশ পাওয়াও গেল, কিন্তু উৎসাহভরে সেগুলি আলোয় টেনে এনে পরীক্ষা করতে গিয়ে ডাঃ মিচেল স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ আবার কি রকম প্রাণী! প্রাণীর দেহ কি শক্ত ধাতুর পাত আর তার দিয়ে তৈরী হয়!

মিঃ সেরিফকে তার পরদিনই সান্ ক্রিষ্টোভালে চলে যেতে হয়েছে। সাগর দানবের রহস্য যত গভীরই হোক রেসিডেণ্ট কমিশনারের পক্ষে তারই মীমাংসার জন্যে বসে থাকা চলে না। ডাঃ মিচেল কিন্তু সেই থেকে মিঃ বাফেটের সঙ্গে উগি দ্বীপেই আছেন। আহার-নিদ্রা তিনি একরকম ভুলে গেছেন বললেই হয়, সাগর দানবের অদ্ভুত রহস্য এমন করে তাঁকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু ভেবে তিনি কোন দিকেই কূল-কিনারা পাননি। পরের দিন সকালেই যতগুলি সম্ভব বোমার আঘাতে ফাটা সাগর দানবের দেহের টুকরো তিনি সংগ্রহ করে আনিয়েছেন। তন্ন তন্ন করে সেগুলি বারবার পরীক্ষা করে দেখেছেন কিন্তু তাতে সেগুলি যে কোন প্রকার ধাতু ছাড়া আর কিছু নয় তাই আরো বেশী করে প্রমাণ হয়েছে। প্রোটোপ্লাস্ম্ ছাড়া কোন প্রাণীর দেহ হয় না, কিন্তু প্রোটোপ্লাস্ম্ দূরে থাক মাছের পট্‌কার মত একটি করে বড় রবার গোছের জিনিসের থলে ছাড়া এ প্রাণীর দেহে কোন নরম জিনিসই নেই। সবই কঠিন একরকম মিশ্রিত ধাতুর পাত আর তার।

ডাঃ মিচেলের মাথা ক্রমশঃই বেশী গুলিয়ে গেছে। এগুলি যন্ত্রই যদি হয় তাহলে এ যন্ত্র সৃষ্টি করেছে কারা? পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক জাত কোথায় আছে? এ যন্ত্র প্রশান্ত মহাসাগরের এই নগণ্য দ্বীপে পাঠাবার তাদের উদ্দেশ্য কি? আর যন্ত্র হলেও সেগুলি কোথা থেকে কে চালাচ্ছে?

এসব প্রশ্নের মীমাংসা শেষ পর্যন্ত সামান্য একটা দেশী পুলিশের ছেলেমানুষীর ফলে সম্ভব হবে কে জানত! ডাঃ মিচেল ক'দিন ধরে এ রহস্য ভেদ করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হতাশ মনে তখন সান্ ক্রিষ্টো-ভাল হয়ে আবার অষ্ট্রেলিয়া ফিরে যাবার সঙ্কল্প করেছেন। এতবড় আবিষ্কারের কথা কিছুই তিনি বৈজ্ঞানিক জগতকে জানাতে পারবেন না, এই তাঁর দুঃখ। আসল রহস্য সমাধান না করতে পারলে সাগর থেকে যন্ত্র-দানব ওঠার কথা তাঁর মুখ থেকে বেরুলেও যে পাগলামি বলে গণ্য হবে, একথা তিনি জানেন। তাই তিনি এ বিষয়ে নীরব থাকাই উচিত বলে ঠিক করেছেন।

রওনা হবার আগের রাত্রে একজন দেশী পুলিশকে তাঁর জিনিস-পত্র গোছাতে বলে তিনি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলেন মিঃ বাফেটের সঙ্গে। ফিরে এসে পুলিশটার কাণ্ড দেখে তিনি একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সে হতভাগা তাঁকে তখন লক্ষ্য করেনি। মাছের পট্‌কার মত রবারের থলেটা সে ঘুষি মেরে ফাটাবার মজাতেই মত্ত।

তার গালে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করবার জন্যে ডাঃ মিচেল পিছন থেকে হাত তুললেন কিন্তু চড় মারা আর হল না। হঠাৎ ফট্ করে পট্‌কার মত থলেটা ফেটে গেল এবং তার থেকে কিলবিল করে যে জিনিসটি বেরিয়ে এল তার দিকে চেয়ে ডাঃ মিচেলের চোখে আর পলক পড়ল না বলা চলে।

জিনিস নয়, সেটি একটি প্রাণী—অদ্ভুত জাতের একটি অক্টোপাস। তাঁর চোখের সামনেই তার চেহারা ফুঁ-দেওয়া বেলুনের মত ফুলে উঠে ফুটি-ফাটা হয়ে গেল। ডাঃ মিচেল বিস্ময়ে উত্তেজনায় খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন—পেয়েছি পেয়েছি!

মিঃ বাফেট ছুটে এলেন—কি পেয়েছেন মিঃ মিচেল ?

—কি আবার! সাগর দানবের রহস্যের কিনারা। আসল সাগর দানব কে জানেন, ওই দেখুন। মানুষ যেমন সমুদ্রে সাবমেরিন চালায়, এও তেমনি স্থলের ওপর ওঠার যন্ত্র আবিষ্কার ও আয়ত্ত করেছে।

ডাঃ মিচেল তার পর একটু বিশদ করে রহস্যটা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন—যে যন্ত্রটি তাঁরা দেখেছেন, সেটি সাগর-দানবের বাহন মাত্র। সাগর-দানব আসলে ঐ ছোট অক্টোপাস।

সমুদ্রের বুকে অত্যন্ত গভীর স্তরে যে তার বাস রবারের থলে ফেটে যাবার পর তার দেহ ফেঁপে ফুলে ওঠাই তার প্রমাণ। সমুদ্রের নীচে জলের চাপ অনেক বেশী, সেই চাপ ও স্বাভাবিক জলের আবেষ্টন রবারের থলেটির ভেতর বজায় রাখবার ব্যবস্থা আছে। রবারের থলেটির ভেতর থেকেই সাগর দানব তার যন্ত্র চালায়। রবারের থলেটি ফাটতে বাইরের চাপ' হাল্কা হয়ে যেতেই সাগর দানবের দেহটি ফেঁপে ফুলে এই অবস্থা হয়েছে।

মিঃ বাফেট সবিস্ময়ে বললেন—কিন্তু সামান্য অক্টোপাসের—

ডাঃ মিচেল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—সামান্য নয় মিঃ বাফেট। অক্টোপাস যে সমুদ্রের সব জীবশ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান এ প্রমাণ আমরা আগে পেয়েছি। তবে এতদূর যে তারা যেতে পারে তা' ভাবতে পারিনি।

তারপর ডাঃ মিচেল সাগর দানবের রহস্য সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর প্রবন্ধ নানা বৈজ্ঞানিক কাগজে লেখেন সাধারণের কাছে তা' দুর্বোধ্য

হলেও পৃথিবীর সর্বত্র বড় বড় দেশের টনক তা'তে নড়ে উঠেছে। সাগরের অতলে অক্টোপাস জাতীয় যে প্রাণী ক্ষমতায় এতদূর অগ্রসর হয়ে মানুষের সঙ্গে টেক্কা দেবার উপক্রম করছে তাকে অবজ্ঞা করা আর উচিত মনে হয়নি। সকলেই বুঝেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের কোন গোপন-কোণে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী জলজপ্রাণীর এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। তার সন্ধান সময় থাকতে আর না নিলে নয়।

অত্যন্ত শক্তিমান একটা সাবমেরিন তাই প্রশান্ত মহাসমুদ্রের জল ঘুলিয়ে ফিরছে। সন্ধান কিন্তু এখনও মেলেনি।